পাতাবাহার

বাংলা। তৃতীয় শ্রেণি

বিদ্যালয় শিক্ষা-দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পর্ষদ-এর কথা

মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে একটি ‘বিশেষজ্ঞ কমিটি’ তৈরি করেন। এই কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলিকে সমীক্ষা এবং পুনর্বিবেচনা করার। সেই কমিটির সুপারিশ মেনে নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণির বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে।

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ -এই নথিদুটিকে অনুসরণ করে নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মাণ করা হয়েছে। সেই কারণেই প্রতিটি বই একটি বিশেষ ভাবমূল (Theme)-কে কেন্দ্রে রেখে বিন্যস্ত করা হলো। প্রথাগত অনুশীলনীর বদলে হাতে-কলমে কাজ (Activity) -এর ওপর জোর দেয়া হয়েছে। বইটিকে শিশুকেন্দ্রিক এবং মনোগ্রাহী করে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ বইটি প্রস্তুত করতে প্রভূত শ্রম অর্পণ করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

বইয়ের শেষে ‘শিখন পরামর্শ’ অংশে বইটি কীভাবে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে হবে সেবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এছাড়া, নতুন বইটিতে ‘ভাষা-ব্যাকরণ’ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণার কয়েকটি সূত্র শেষাংশে সংযোজিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত পাঠ্যবই প্রকাশ করে সরকার-অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করে। এই প্রকল্প রূপায়ণে নানাভাবে সহায়তা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন। বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী মানুষের মতামত আর পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর, ২০১৭

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি-কে ৭/১, সেক্টর ২
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

মানিক ভট্টাচার্য
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক - এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করার সময় থেকেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF 2005) এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE 2009) এই নথি দুটিকে অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছি।

প্রতিটি শ্রেণির 'বাংলা' বইয়েরই কেন্দ্রে রয়েছে একটি বিশেষ ভাবমূল (Theme)। তৃতীয় শ্রেণির 'বাংলা' বইয়ের কেন্দ্রীয় ভাবমূল 'প্রচলিত গল্পকথার জগৎ'। বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষায় সামর্থ্য অর্জনের দিকটিকে যেমন আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছি, তার সঙ্গে কৃত্যালি-নির্ভর অনুশীলন, সংগীত, ছবি আঁকা, অভিনয়, হাতের কাজ, ব্রতচারী প্রভৃতি আনন্দময় উপকরণকেও সংযোজিত করা হয়েছে। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, '...বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। ... আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে ফললাভ করে।' আমরা এই বক্তব্যকে মান্য করে বইটি প্রস্তুত করেছি।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন,পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রাথমিক স্তরের বাংলা বইগুলি 'পাতাবাহার' পর্যায়ের অন্তর্গত। 'পাতাবাহার তৃতীয় শ্রেণি' বইটির শেষাংশে 'ভাষাপাঠ' এবং শিখন পরামর্শ সংযোজিত হলো। ব্যাকরণের প্রাথমিক ধারণা শিক্ষার্থীদের দেবার জন্যই 'ভাষাপাঠ' অংশটির অবতারণা। বইটি শিক্ষার্থীদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর, ২০১৭

বিকাশ ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

রত্না চক্রবর্তী বাগচী (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ)

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়

সুদক্ষিণা ঘোষ রুদ্রশেখর সাহা মিথুন নারায়ণ বসু

সহযোগিতা

শুভময় সরকার চিরঞ্জীব সরকার শ্রীময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপা বিশ্বাস ঋতম মুখোপাধ্যায় মীনাক্ষী চৌধুরী মণিকণা মুখোপাধ্যায়

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

এ.কে. জালালউদ্দিন

অরুণ কুমার ঘোষ

বিদ্যুৎ বরণ চৌধুরী

সুব্রত মাজী

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা

জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

সূচিপত্র

প্রথম পাঠ
পৃষ্ঠা ১

সত্যি সোনা

আমরা চাষ করি আনন্দে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিজের হাতে নিজের কাজ

দ্বিতীয় পাঠ
পৃষ্ঠা ১৮

দেয়ালের ছবি

সারাদিন
সুনির্মল চক্রবর্তী

তৃতীয় পাঠ
পৃষ্ঠা ২৭

ফুল
সুখলতা রাও

আজ ধানের ক্ষেতে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চতুর্থ পাঠ
পৃষ্ঠা ৩৪

সোনা
গৌরী ধর্মপাল

নদী
শক্তি চট্টোপাধ্যায়

নদীর তীরে একা
জীবন সর্দার

পঞ্চম পাঠ
পৃষ্ঠা ৫০

নৌকাযাত্রা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঢেউয়ের তালে তালে
পিনাকীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

পর্যটন
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ষষ্ঠ পাঠ
পৃষ্ঠা ৬২

গাছেরা কেন চলাফেরা করে না

জুঁই ফুলের রুমাল
কার্তিক ঘোষ

সাথি
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সপ্তম পাঠ
পৃষ্ঠা ৮২

একা একা থাকতে নেই

আরাম
শঙ্খ ঘোষ

হিংসুটি
সুকুমার রায়

অষ্টম পাঠ
পৃষ্ঠা ৯৬

মনকেমনের গল্প
নবনীতা দেবসেন

দেশের মাটি
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

নবম পাঠ
পৃষ্ঠা ১০৪

কীসের থেকে কী যে হয়

আগমনী
প্রেমেন্দ্র মিত্র

উড়ুক্কু ভূত
শৈলেন ঘোষ

দশম পাঠ
পৃষ্ঠা ১১৮

কে ছিলেন ইশপ

পানতাবুড়ি
যোগীন্দ্রনাথ সরকার

ঘুমিয়ো নাকো আর
বিমল চন্দ্র ঘোষ
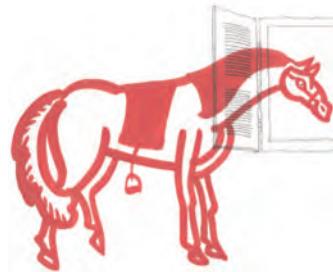
ভাষাপাঠ
পৃষ্ঠা ১৩৪

শিখন পরামর্শ পৃষ্ঠা ১৫৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : দেবব্রত ঘোষ
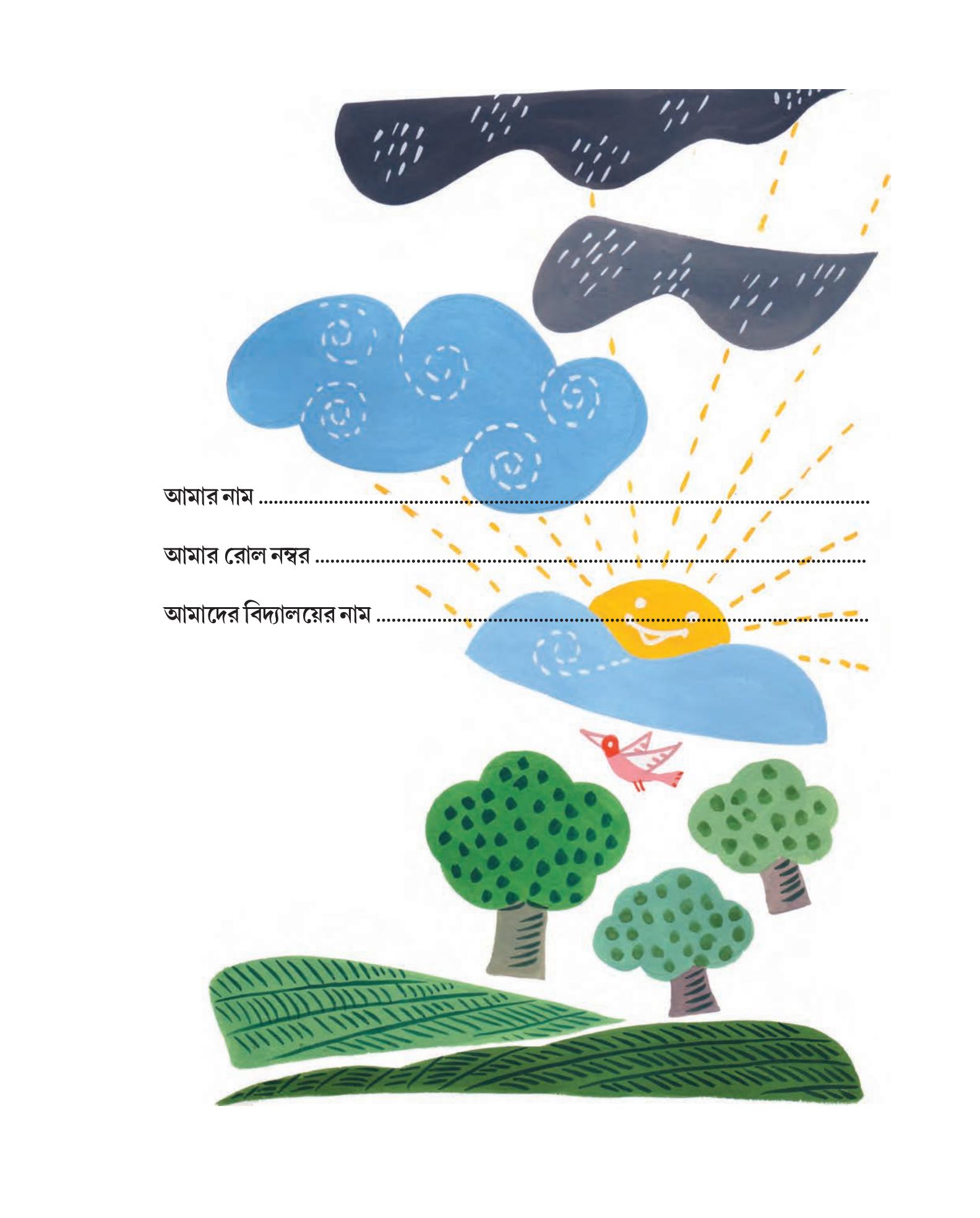
সত্যি সোনা

প্রচলিত গল্প

বুড়ো চাষির কঠিন অসুখ করেছে। বাঁচার আশা নেই। সেই সময় একমাত্র ছেলেকে ডেকে বলল, 'ওহে বাপু আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। যাওয়ার সময় তোমাকে একটা দরকারি কথা বলে যাই।'

চাষির ছেলে ভারি অলস। অথচ টাকা পয়সার লোভ তার ষোলোআনা। তার ধারণা বাবা অনেক সোনা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। বাপকে বলল, 'তোমার লুকোনো সোনা কোথায় রাখা আছে তা তো বলে গেলে না।'

হেসে বুড়ো বাপ বলল, 'সেটা বলব বলেই তো ডেকেছি তোমায়। শোনো, এই যে আমাদের চাষের জমি দেখছ, এর নীচেই পোঁতা আছে লুকোনো সোনা। আমি চোখ বুজলে তুমি তা খুঁজে বার করে নিয়ো।' ওই কথা কটি বলেই চিরদিনের মতো চোখ বুজল সে।

ছেলের চোখ দুটো লোভে চকচক করে ওঠে।

বাবা মারা যাওয়ার পর ছেলে তার বউকে বলল, 'বাবা তো বলে গেল আমাদের জমির তলায় সোনা পোঁতা আছে। কিন্তু ঠিক কোন জায়গায় আছে তা তো বলে গেল না।'

ছেলের বউ খুব বুদ্ধিমতী। সে বলল, ‘তোমার গোটা জমিটা খুঁড়েই দেখতে হবে কোথায় আছে সোনা।’

ছেলে জমি চাষ-আবাদ করার কথা ভাবতে পারে না। সে চিরকাল শুয়ে বসে কাটিয়েছে। কিন্তু সোনার লোভ বড়ো লোভ । আবার আলসেমির রোগও কম নয়। তাই সকালে উঠে সে কেবল গড়িমসি করে। বউ যখন মনে করিয়ে দেয় সোনা খোঁজার কথা, তখন সে গজগজ করে। ‘দূর কোথায় সোনা পোঁতা আছে তার ঠিক নেই। কে যাবে খোঁড়াখুঁড়ি করতে ? তার চেয়ে টেনে ঘুম দেওয়া অনেক ভালো।’

বউ বলে, ‘তুমি মজুর লাগিয়ে জমি খোঁড়াও না। সোনা যদি পাও তবে আমাদের কপাল ফিরে যাবে। চুপচাপ বসে থেকে কী লাভ? বাবা যখন বলেছেন তখন চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?’

বউয়ের পরামর্শ শুনে ছেলে দুজন মজুর ডাকিয়ে জমি খুঁড়তে লাগিয়ে দেয়।

তার বউ আবার এসে বলে, ‘ওদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে বসে থেকো না যেন। তুমি কোদাল নিয়ে যাও। তা না হলে ওরা যদি সোনার তালটা পেয়ে যায় তবে তা সরিয়ে ফেলতে কতক্ষণ!’

ছেলে ভাবে বউ ঠিক কথাই বলেছে। ওদের বিশ্বাস কী? ওরা যদি সোনার তাল সরিয়ে ফেলে তবে সব চেষ্টা বৃথা। তাই সেও একটা কোদাল নিয়ে কাজে লেগে যায় মাঠে। কাজ করতে করতে ওদের ওপর নজর রাখার সুবিধে হবে। যত মাটি খোঁড়ে চাষির ছেলে, তত সোনার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে সে।

কিন্তু সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত পাঁচ বিঘে জমি খোঁড়াখুঁড়ি করেও কোথাও এতটুকু সোনা পাওয়া গেল না। রাগে বিরক্তিতে অস্থির ছেলে তখন তার বউকে বলল, ‘বাবা নিশ্চয় আমায় বোকা বানিয়েছে। সোনা-দানা কিছুই নেই। মিছিমিছি আমায় খাটিয়ে মারলে।’

বউ হেসে বলল,‘কিন্তু দেখ, জমিটা এখন ঠিক চাষ করার মতো হয়েছে।’

ছেলে তার বউয়ের মুখের দিকে তাকাল। বউ বলল, ‘আর কদিন পরেই বর্ষা নামবে। এই তো বীজ বোনার সময়। বাবা প্রতি বছর এই সময় জমিতে ধান চাষ করতেন। কী সুন্দর ফসল হতো।’

শুনে ছেলে ভাবল, জমিটা যখন খুঁড়েই ফেলা হয়েছে তখন ওটা এমনি ফেলে না রেখে চাষ করে ফেলাই ভালো। তার বউ হাট থেকে সবচেয়ে সেরা ধানের বীজ কিনে আনল। স্বামী সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ক্ষেতে কাজ করে। বউ তার খাবার নিয়ে যায়। তামাক সেজে নিয়ে যায়। অলস স্বামীকে এই ভাবে কাজ করতে দেখে গর্বে বুক ভরে যায় তার।

তারপর যথাসময়ে বর্ষা নামল। সে বছর বৃষ্টিও হলো খুব ভালো। অল্পদিনের মধ্যে ক্ষেত ভরে গেল শস্যে। মাঠ ভরা পাকা ধানের রাশি দেখে মনে হলো সত্যি কে যেন সোনা ঢেলে দিয়েছে মাঠে!

বউ বলল, ‘দেখো, বাবা মিথ্যে বলেননি। সত্যি সত্যি সোনা ফলেছে মাঠে।’

ছেলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মাঠের দিকে। জমিতে যে এত ভালো ফসল ফলে তা সে এই প্রথম জানল।

ফসল কাটার পর তা হাটে বিক্রি করে এক থলি টাকা পেল চাষির ছেলে। বাড়ি ফিরে সে বউকে বলল, ‘এই দেখো কত টাকা। আমার ধারণা ছিল না যে জমি চাষ করে এত রোজগার করা যায়।’

বউ খুব খুশি। এই তার স্বামীর প্রথম রোজগার। হেসে বলল, ‘তা হলে বাবার কথাই ঠিক তো? জমিতে সত্যিই সোনা পোঁতা ছিল?’

মাথা নেড়ে ছেলে জবাব দিল, ‘ষোলোআনা। আজ আমি বুঝেছি যে বুদ্ধি খাটালে আর কঠোর পরিশ্রম করলে তার পুরস্কার পেতে দেরি হয় না।’

১. **একটি বাক্যে উত্তর দাও:**

১.১ বুড়ো চাষির সংসারে কে কে ছিল?

১.২ চাষির ছেলেটি কেমন প্রকৃতির ছিল?

১.৩ বাপের কথা শুনে ছেলের মনের অবস্থা কেমন হলো?

১.৪ বুড়ো চাষি কোন কথাটা তাঁর ছেলেকে বলে যাননি?

২. **সংক্ষেপে উত্তর দাও:**

২.১ চাষির ছেলে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কতটা জমি খুঁড়েছিল?

২.২ চাষির ছেলের প্রথম রোজগারে কে খুশি হয়েছিল?

২.৩ গল্পে কোদাল দিয়ে মাটি খোঁড়ার কথা বলা আছে. আর কী কী জিনিস দিয়ে মাটি খোঁড়া যায় বলে তোমার জানা আছে?

২.৪ 'সত্যি সোনা' গল্পটির মতো আর কোন গল্প তোমার জানা আছে? জানা গল্পটি বন্ধুদের শোনাও।

৩. **বন্ধনীর মধ্যে থেকে ঠিক উত্তরটা বেছে নিয়ে পুরো কথাটা আবার নীচে লেখো :**

৩.১ ছেলের চোখ দুটো লোভে (ঝকঝক / চকচক / ঝকমক / ঝিকমিক) করে ওঠে।

৩.২ চাষির ছেলের বউ ছিল খুব (চালাক/সরল/বোকা/বুদ্ধিমতী)।

৩.৩ বউ বলেছিল, 'সোনা যদি পাও তবে (আমাদের/তোমার/মজুরদের/আমার) কপাল ফিরে যাবে।'

৩.৪ চাষির ছেলে ফসল কাটার পর তা (কম পয়সায়/দোকানে/হাটে/বাজারে) বিক্রি করে।

শব্দার্থ : ষোলোআনা — সম্পূর্ণ, পুরোপুরি। চুকে যাওয়া — সম্পন্ন হওয়া। গড়িমসি — আলসেমি, দীর্ঘসূত্রতা। মরিয়া — বেপরোয়া। শস্য — ফসল। ধারণা — বোধ, অনুভূতি, উপলব্ধি। পরিশ্রম — খাটুনি, মেহনত।

৪. **সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখো :**

৪.১ চাষির ছেলে নিজে চাষ-আবাদ করার কথা ভাবতে পারত না কেন?

৪.২ শেষ পর্যন্ত চাষির ছেলের মাঠে কাজ করতে যাওয়ার কারণ কী ছিল?

৪.৩ চাষির ছেলের বউ কোন সময়কে বীজ বোনার উপযুক্ত সময় বলেছে?

৪.৪ সে কোথা থেকে বীজ কিনে এনেছিল?

৪.৫ সে কীসের বীজ কিনেছিল?

৪.৬ গল্পের কোন মানুষটাকে তোমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ হলো?

৫. **নিজের ভাষায় উত্তর দাও :**

৫.১ 'সেটা বলব বলেই তো ডেকেছি তোমায়'— কে এই কথা বলেছে? সে কাকে এই কথা বলেছে? সে তাকে কী বলার জন্য ডেকেছিল?

৫.২ গল্পে চাষির ছেলের বউ চাষির ছেলেকে কীভাবে সাহায্য করেছে তা লেখো।

৫.৩ 'সত্যি সত্যি সোনা ফলেছে মাঠে'— কে এই কথা বলেছে? সোনা বলতে এখানে আসলে কোন জিনিসকে বোঝানো হয়েছে? সেই জিনিসটা সোনা না হলেও তার সঙ্গে সোনার কী কী মিল আছে?

৫.৪ চাষির ছেলে ফসল বিক্রি করে বাড়ি ফিরলে তার বউ কী কারণে খুব খুশি হলো?

৫.৫ চাষির ছেলে আর তার বউ বুদ্ধি খাটিয়ে আর পরিশ্রম করে কী পুরস্কার পেয়েছে?

৫.৬ 'ছেলের বউ খুব বুদ্ধিমতী'— তার বুদ্ধির প্রকাশ গল্পে কীভাবে লক্ষ করা গেল?

৬. **সোনা সকলের কাছেই পছন্দের। কারণ তার কতগুলো গুণ আছে। সেই গুণগুলো পাশের বাক্স থেকে নিয়ে তুমি নীচের ফাঁকা জায়গাগুলোয় বসাও :**

চকচকে, আসল, দামি, ঝলমলে

৬.১ পিতলের থালাটা সোনার মতোই ________ ।

৬.২ পাকা ধান সোনার মতোই ________ ।

৬.৩ ________ সোনা দিয়ে গয়না বানানো যায় না।

৬.৪ রুপো চকচকে হলেও সোনার চেয়ে কম________ ।

৭. ‘সত্যি সোনা’ গল্পটির সাহায্য নিয়ে ছবিগুলির নীচে উপযুক্ত বাক্য লিখে কাহিনিটি সম্পূর্ণ করো :

৭.১ ____________________

৭.২ ____________________

৭.৩ ____________________

৭.৪ ____________________

৭.৫ ____________________

৭.৬ ____________________

৭.৭ ____________________

অঙ্কন : সুব্রত মাজী

- ‘সত্যি সোনা’ গল্পে কুঁড়েমির বদলে কাজ করার কথা বলা হয়েছে। আর কাজেও আছে আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই লেখায় সেই আনন্দেরই ছবি ধরা পড়েছে। লেখাটি ‘সত্যি সোনা’ গল্পটির সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে।

আমরা চাষ করি আনন্দে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে,
বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা
রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন তরুণ কবি নৃত্য-দোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে,
সকল ধরা হেসে ওঠে—
অঘ্রানেরই সোনার রোদে, পূর্ণিমারই চন্দ্রে।

হাতে কলমে

১. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

১.১ চাষ করার জমিকে কী বলা হয়?

১.২ চাষের কাজে কী কী জিনিস না হলে চলে না?

১.৩ ধানগাছ থেকে কী কী জিনিস আমরা পাই?

১.৪ 'সকল ধরা হেসে ওঠে'—এখানে 'ধরা' শব্দটির অর্থ কী?

১.৫ 'ধরা' শব্দটিকে অন্য অর্থে ব্যবহার করে একটা বাক্য লেখো।

১.৬ 'পুলক' শব্দটি দিয়ে একটা বাক্য রচনা করো।

১.৭ 'অঘ্রান' মাসটির পুরো নামটি কী?

শব্দার্থ : রৌদ্র — রোদ্দুর। চষা — চাষ করা হয়েছে এমন। তরুণ — কিশোর, নবযৌবন প্রাপ্ত। নৃত্য-দোদুল — নাচের তালে দুলছে এমন। পুলক — রোমাঞ্চ আনন্দ। ধরা — পৃথিবী। অঘ্রান — অগ্রহায়ণ (মাসের নাম)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। 'সহজপাঠ', 'কথা ও কাহিনী', 'রাজর্ষি', 'ছেলেবেলা', 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ', 'হাস্যকৌতুক', 'ডাকঘর', 'গল্পগুচ্ছ'- সহ তাঁর বহু রচনাই শিশু-কিশোরদের আকর্ষণ করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। ১৯১৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা।

২. **শূন্যস্থানে ঠিক বর্ণ বসিয়ে শব্দ তৈরি করো :**

ক) স___ ঘ) শি___

খ) গ___ ঙ) অ___ন

গ) বৃ___ চ) রৌ___

৩. **তোমার পড়া গানটির একটি পঙ্‌ক্তি নীচে দেওয়া আছে। তার পরের দুটি লাইন গান থেকে তুমি লেখো :**

সবুজ প্রাণের গানের লেখা

————————————————————————

———————————————————————— ।

৪. **বাঁদিকের সঙ্গে ডানদিক মেলাও :**

বাঁদিক	ডানদিক
ক) বাঁশের বনে	ক) পুলক ছোটে।
খ) সকল ধরা	খ) সকাল হতে সন্ধে।
গ) বাতাস ওঠে ভরে ভরে	গ) হেসে ওঠে।
ঘ) মাঠে মাঠে বেলা কাটে	ঘ) চষা মাটির গন্ধে।
ঙ) ধানের শিষে	ঙ) পাতা নড়ে।

৫. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৫.১ সুর দিয়ে গাওয়া হয় গান আর রেখা দিয়ে যে কাজ করা হয় তা হলো _________ ।

৫.২ অঘ্রান মাসের আগের মাসের নাম হলো _________ ।

৫.৩ অঘ্রান মাসের পরের মাসের নাম হলো _________ ।

৫.৪ অঘ্রান মাস _________ ঋতুর মধ্যে পড়ে।

৬. **যাঁরা চাষ করেন তাঁদের চাষি বলে।**

তাহলে, যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের বলে _________ ।

যাঁরা কাঠ দিয়ে খাট, চেয়ার-টেবিল, আলনা, দরজা-জানালা বানান তাঁদের বলে _________ ।

যাঁরা ইটের বাড়ি বানান তাঁদের বলে _________ ।

যাঁরা মাটির বাড়ি বানান তাঁদের বলে _________ ।

যাঁরা মাছ ধরেন তাঁদের বলে _________ ।

৭. নীচের বাক্যগুলির দাগ দেওয়া অংশে কোনো না কোনো কাজ বোঝাচ্ছে। তুমি গানটি থেকে এমন আরো কয়েকটি কথা বের করে নীচে লেখো, যা দিয়ে কাজ করা বোঝায়।

ক) রৌদ্র ওঠে।

খ) বৃষ্টি পড়ে।

গ) পাতা নড়ে।

ঘ) চাষ করি আনন্দে।

৮. সারাদিন বৃষ্টি হলে তুমি দিনটা কীভাবে কাটাবে, নীচে চার লাইনে লেখো :

নিজের হাতে নিজের কাজ

কারমাটার রেল স্টেশন। একটি ট্রেন এসে দাঁড়াল।

ট্রেন থেকে এক বাঙালি ডাক্তারবাবু নামলেন। হাতে একটি ব্যাগ। ব্যাগটি ছোটো কিন্তু মানুষটি যে সম্মানে বড়ো। ডাক্তার বলে কথা। নিজে হাতে ব্যাগ বইতে হয়তো তাঁর লজ্জা বোধ হয়। তাই তিনি 'কুলি—কুলি' বলে চিৎকার শুরু করে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই এক কুলি এসে হাজির।

কুলি ডাক্তারবাবুর ব্যাগ মাথায় তুলে নিয়ে স্টেশনের বাইরে অপেক্ষারত পালকিতে তুলে দিল। তারপর সে চলে যেতে উদ্যত হলো। ডাক্তারবাবু উদার মনোভাবের মানুষ। তাই তিনি কুলিকে ডেকে তার হাতে পয়সা দিতে গেলেন পারিশ্রমিক হিসাবে।

কুলি বলল, 'পয়সা লাগবে না।'

—'কেন?'

'আপনি ব্যাগটি নিয়ে বিপদে পড়েছিলেন, তাই একটু সাহায্য করলাম মাত্র। আমার নাম ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা।'

নাম শুনে ডাক্তারবাবু চমকে উঠলেন।

তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাকে আমি চিনতে পারিনি।'

কুলি বলল, 'তাতে আর কী হয়েছে।'

ডাক্তারবাবুর সেদিন উচিত শিক্ষা হলো।

তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, 'আমি আর কখনও নিজের কাজ নিজে হাতে করতে সঙ্কুচিত হব না।'

হাতে কলমে

১. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১.১ একজন ডাক্তারবাবু কীভাবে সমাজের সেবা করে থাকেন?

১.২ কোথায় কোথায় কুলিদের কাজ করতে দেখা যায়?

২. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

২.১ বাঙালি ডাক্তারবাবু কোন স্টেশনে নামলেন?

২.২ গল্পে কুলিটি ডাক্তারবাবুর ব্যাগটি কীভাবে বয়ে নিয়ে গেলেন?

২.৩ ডাক্তারবাবুর ব্যাগটি নিয়ে কুলিটি কোথায় তুলে দিলেন?

২.৪ কুলিটি তাঁর নিজের নাম কী বলেছিলেন?

৩. বর্ণঝুড়ি থেকে ঠিক বর্ণটি নিয়ে শূন্যস্থানে বসিয়ে শব্দ তৈরি করো :

ডা ____ র   স ____ ন   অপে ____

পারি ____ মিক   ল ____ ত   স ____ চিত

শ্র, ঙ্কু, ক্ষা,
ক্তা, জ্জি, ম্মা

৪. নীচের বাঁদিকের কথাগুলির মধ্যে যেটা ঠিক তার পাশে (✓) চিহ্ন আর যেটা ভুল তার পাশে (✗) চিহ্ন দাও :

৪.১ ট্রেন থেকে এক ডাক্তারবাবু নামলেন। ☐

৪.২ ডাক্তারবাবুর হাতে ছিল একটি ওষুধের বাক্স। ☐

৪.৩ কুলি—কুলি বলে চিৎকার করতে ডাক্তারবাবুর লজ্জা বোধ হয়। ☐

৪.৪ গল্পের কুলিটি সম্মানে ডাক্তারবাবুর চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন। ☐

৫. বর্ণগুলিকে জুড়ে শব্দ তৈরি করো :

শ্ + ই + ক্ + ষ্ + আ

ড্ + আ + ক্ + ত্ + আ + র্ + ব্ + আ + ব্ + উ

অ +প্ + এ + ক্ + ষ্ + আ

ব্ +য্ + আ +গ্

৬. বর্ণবিশ্লেষণ করো :

কারমাটার, স্টেশন, পারিশ্রমিক, ঈশ্বরচন্দ্র, ক্ষমা

৭. একই অর্থের শব্দ লেখো :

উপস্থিত, ক্ষুদ্র, মর্যাদা, কুণ্ঠিত, থলে।

৮. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :

সম্মান, লজ্জা, শিক্ষা, উচিত, সঙ্কুচিত।

৯. বাক্য বাড়াও :

৯.১ কুলি হাজির। (কোথায়?)

৯.২ ডাক্তারবাবু চমকে উঠলেন। (কেন?)

৯.৩ তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন। (কী প্রতিজ্ঞা?)

৯.৪ ট্রেন এসে দাঁড়াল। (কোথায়?)

১০. গল্পের ঘটনাক্রম সাজিয়ে লেখো :

১. ডাক্তারবাবু তাঁর ব্যাগ বইতে লজ্জা পাচ্ছিলেন।

২. ডাক্তারবাবুর সেদিন উচিত শিক্ষা হলো।

৩. কুলি বলল, 'পয়সা লাগবে না।'

৪. ডাক্তারবাবুর ডাকে কুলি এসে হাজির হলো।

৫. একটি ট্রেন এসে দাঁড়াল।

শব্দার্থ : অপেক্ষারত — যিনি অপেক্ষা করছেন। উদ্যত — প্রবৃত্ত, উন্মুখ। পারিশ্রমিক — মজুরি। উদার — মহৎ, করুণাপূর্ণ। প্রতিজ্ঞা — শপথ। সঙ্কুচিত — কুণ্ঠিত, জড়সড়ো।

১১. নিজের ভাষায় উত্তর দাও :

১১.১ কার নিজে হাতে ব্যাগ বইতে লজ্জাবোধ হয়েছিল?

১১.২ ব্যাগ বইতে তাঁর লজ্জা হওয়ার কারণ কী?

১১.৩ ডাক্তারবাবু কেন কুলিকে পয়সা দিতে গিয়েছিলেন?

১১.৪ ডাক্তারবাবুর দিতে চাওয়া পয়সা কুলিটি নিলেন না কেন?

১২. তোমার জানা একটা রেলস্টেশনের নাম :

----

১৩. গল্পের ঈশ্বরচন্দ্র শর্মাকে আমরা যে নামে চিনি তা হলো :

দেয়ালের ছবি

অনেক অনেক দিন আগের কথা। সেই কালে আমাদের দেশে ছিল ঘন বন। আমরা তখন বনের ধারে এক গাঁয়ে থাকতাম। চাষ করতাম, বনে শিকার করতাম। সে ছিল বড়ো সুখের দিন। কোথায় হারিয়ে গেল সেসব সুখের দিন!

সেই কালে বনের ধারে গাঁয়ে থাকত এক শিকারি। সে সবসময় বনে বনে ঘুরত। তার ছিল না কোনো ভয়-ডর। উলটে বনের পশুপাখিই তাকে ভয় করত। হাতে তির-ধনুক-গুলতি নিয়ে সে ঘুরত। এমন কি রাতে শোওয়ার সময়েও তার বিছানার পাশে থাকত তির-ধনুক-গুলতি।

সকালে গাঁয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সে। আঁধার হওয়ার আগে পর্যন্ত বনে বনে ঘোরে। গাছের ফল খায়, পাখি শিকার করে বনেই রান্না করে খায়। বড়ো আনন্দে থাকে সে।

এমনি করে একদিন এক বাঘের সঙ্গে তার দেখা হলো। দুজনেই খুশি। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হলো। দুজনেই খুব বন্ধু হয়ে গেল। প্রায় প্রতিদিনই দেখা হয়। খুব ভাব দুজনের।

একদিন শিকারি বলল, 'বন্ধু, অনেকদিন হয়ে গেল, দুজনেই খুব বন্ধু হয়ে গেলাম। তাহলে চলো একদিন আমার বাড়িতে। আমার ভালো লাগবে।'

বাঘ বলল, 'এ আর এমন কী। যাওয়াই যায়। চলো এখনই যাই। বন্ধুর বাড়ি যাব, তাতে আর আপত্তি কী!'

দুজনে রওনা দিল বনের পথে। বন পেরিয়ে মাঠ। মাঠের পাশে ফসলের জমি। তার পাশেই শিকারির বাড়ি। ছোটো দাওয়া পেরিয়ে তারা ঘরে ঢুকল। ছিমছাম পরিষ্কার সুন্দর ঘর। চোখ জুড়িয়ে যায়। বাঘ ঘরে ঢুকে মাটির ঠান্ডা মেঝেয় বসে পড়ল। আঃ, কী আরাম!

শিকারি লোটায় করে পুকুরের ঠান্ডা জল এনে দিল। বাঘ জিভ দিয়ে চেটে চেটে লোটার জল

খেল। বন্ধুর দিকে ডাগর চোখে চেয়ে রইল।

বাঘ হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে ঘরের দেয়ালে একটা হাতে-আঁকা ছবি দেখতে পেল। উঠে ছবির কাছে গেল। দেখল, একজন মানুষ শিকারি দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার হাতে তির-ধনুক আর মাটিতে শুয়ে রয়েছে একটা বাঘ। শিকারি বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে রয়েছে, যেন মনে হচ্ছে বিরাট কোনো কাজ করেছে।

শিকারি খুব মজা পেয়েছে। বলল, 'আমার ঠাকুরদা, মস্ত শিকারি ছিলেন। দেখো, তিনি কেমন বিশাল বাঘ মেরে পায়ের তলায় রেখে দিয়েছেন। ঠাকুরদা বাঘ-নেকড়ে-চিতা কাউকে ভয় পেতেন না। মস্ত শিকারি ছিলেন। আমার বাবাও মস্ত শিকারি ছিলেন। আমিও তাই।'

বাঘ হাই তুলে বলল, 'ছবিটা এঁকেছে কে?'

শিকারি বলল, 'আমার বাবা এঁকেছেন। তিনি শুধু মস্ত শিকারি ছিলেন না, খুব ভালো আঁকতে পারতেন।'

বাঘ বলল, 'হ্যাঁ সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তা এটা কি মানুষের আঁকা?'

শিকারি বলল, 'কী যে বলো বন্ধু, আমার বাবা তো মানুষই ছিলেন। আমার বাবা তিনি, মানুষ ছাড়া আর কী হবেন?'

বাঘ গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে বলল, 'ছবিটা যদি কোনো বাঘ আঁকত তাহলে অন্যরকম হতো।'

হাতে কলমে

১. **এক বাক্যে উত্তর দাও :**

১.১ দেয়ালে আঁকা ছবি তুমি কোথায় কোথায় দেখেছ?

১.২ অনেক অনেক দিন আগে মানুষ কোথায় বাস করত?

১.৩ তখন তাদের কীভাবে দিন কাটত?

২. **এলোমেলো বর্ণগুলিকে সাজিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করো :**

ম ব স য় স, ন ক নে দি অ, ল দে য়া, র অ ম ক ন্য, ম ম ছা ছি।

৩. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৩.১ সে ছিল বড়ো......... দিন।

৩.২ এমনি করে একদিন এক..........সঙ্গে তার দেখা হলো।

৩.৩ বাঘ বলল, এ আর......... কী।

৩.৪ বলল, আমার............, মস্ত শিকারি ছিলেন।

৩.৫ আমার........... তিনি, মানুষ ছাড়া আর কী হবেন ?

শব্দার্থ : গুলতি — ছোটো পাথর, মাটির গুলি ইত্যাদি ছোঁড়ার প্রাচীন ও দেশীয় অস্ত্র বিশেষ। দাওয়া — বারান্দা। ছিমছাম —পরিপাটি, শোভন। লোটা — ঘটি। ডাগর — বড়ো। মুচকি — মৃদু।

৪. **ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে বাক্যগুলি আবার লেখো :**

৪.১ দেয়ালের ছবিটি এঁকেছিল (শিকারি/শিকারির বাবা/শিকারির ঠাকুরদা/বাঘ)।

৪.২ অনেক অনেক দিন আগে আমাদের দেশে ছিল (ঘন বন/মরুভূমি/বড়ো বড়ো পাহাড়/বিশাল সমুদ্দুর)।

৪.৩ বনের পশুপাখিরা শিকারিকে (ভালোবাসত/ঘৃণা করত/ভয় পেত/উপহাস করত)।

৪.৪ গল্পের বাঘটি ভালো (গান গাইত/গল্প বলত/ছবি আঁকত/কথা বলত)।

৪.৫ শিকারি বাঘকে খেতে দিয়েছিল (গরম দুধ/মাংস/ঠান্ডা জল/চা)।

৫. **বর্ণ বিশ্লেষণ করো :** অনেকক্ষণ, পরিষ্কার, কথাবার্তা, অন্যরকম, নেকড়ে।

৬. **অর্থ লেখো :** আঁধার, আপত্তি, দাওয়া, লোটা, ডাগর।

৭. **সমার্থক শব্দ লেখো:** বিশাল, বাঘ, মজা, ছবি, বাবা, জল, বন্ধু।

৮. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :** অনেক, দিন, ঘন, সুখ, ঠান্ডা, মস্ত।

৯. **গল্পটিতে কয়েকটি জোড়া শব্দ আছে।** একটি যেমন— বনে বনে।
এরকম আরও দুটি জোড়া শব্দ খুঁজে নিয়ে লেখো।

১০. **শব্দযুগলের অর্থ পার্থক্য দেখাও :**

গাঁ	তির	বাড়ি	জিভ	হতো
গা	তীর	বারি	জীব	হত

১১. **'চোখ' শব্দটিকে পাঁচটি আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহার করে বাক্য রচনা করো।**

১২. **বাক্য রচনা করো:** চাষ, মেঝে, আঁকা, বিরাট, দেওয়াল।

১৩. **বাক্য বাড়াও :**

১৩.১ শিকারি জল এনে দিল। (কোথা থেকে, কেমন জল?)
১৩.২ দুজনে রওনা দিল। (কোথায়?)
১৩.৩ সকালে বেরিয়ে যায়। (কোথা থেকে?)
১৩.৪ বাঘ হাসল। (কেমন করে?)
১৩.৫ দুজনেই বন্ধু হয়ে গেল। (কেমন বন্ধু?)

১৪. **গল্পের ঘটনাগুলি ক্রমানুসারে সাজিয়ে লেখো :**

১৪.১ শিকারি খুব মজা পেয়েছে।
১৪.২ বাঘ হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে ঘরের দেয়ালে একটা হাতে আঁকা ছবি দেখতে পেল।
১৪.৩ বাঘ বলল,... বন্ধুর বাড়ি যাব তাতে আর আপত্তি কী!
১৪.৪ বাঘ ঘরে ঢুকে মাটির ঠান্ডা মেঝেয় বসে পড়ল।
১৪.৫ বাঘ বলল,... তা এটা কি মানুষের আঁকা?

১৫. **সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

১৫.১ গল্পের শিকারিটি কীভাবে তার দিন কাটাত?
১৫.২ বনে শিকারির প্রিয় বন্ধুটি কে? তাকে সে একদিন কী প্রস্তাব দিল?
১৫.৩ উত্তরে তার বন্ধু তাকে কী বলল?
১৫.৪ গল্পে শিকারির ব্যাড়িটি কোথায়?
১৫.৫ তার ঘর-বাড়ির চেহারা কেমন?
১৫.৬ শিকারি তার বাড়িতে প্রিয় বন্ধুর যত্ন কীভাবে করেছিল?
১৫.৭ বাঘ হঠাৎ দেয়ালে কীসের ছবি দেখল?
১৫.৮ শিকারির মজা পাওয়ার কারণ কী?
১৫.৯ নিজের ঠাকুরদা সম্পর্কে শিকারি কোন কথা বাঘকে বলল?
১৫.১০ সে ব্যাপারে বাঘ আগ্রহ দেখাল না কেন?
১৫.১১ বাঘের কোন কথা শুনে শিকারি অবাক হয়েছিল?
১৫.১২ দেয়ালের ছবিটির বিষয় কী ছিল? ছবিটি কোনো বাঘ আঁকলে, সেটির বিষয় কী হতো?

সারাদিন

সুনির্মল চক্রবর্তী

সারাদিন ভালো লাগে
নানা ছবি আঁকতে,
খাতার পাতায় চাই
মনখানা রাখতে।
হিজিবিজি ভাবনারা
মনে আসে যখনই,
ছবি হয়ে খাতাটায়
রয়ে যায় তখনই।
হাতি ঘোড়া গাছ পাখি
আঁকি আমি কত কী,

কেন আঁকি এইসব
আমি জানি অত কি?
এতসব আঁকি তবু
মন ভরে যায় না,
আসলে এ খাতা ছেড়ে
মন যেতে চায় না।।

১. এক বাক্যে উত্তর দাও :

১.১ খাতা ছাড়া আর কোথায় কোথায় মানুষকে লিখতে দেখেছ তুমি?

১.২ লেখালেখি ছাড়া খাতায় তুমি আর কী কী করেছ?

১.৩ খাতার পৃষ্ঠা দিয়ে কী কী খেলা ছোটোরা খেলতে পারে?

১.৪ ছবি আঁকার খাতা আর লেখার খাতার তফাত কোথায়?

১.৫ ছবি আঁকতে সাধারণত কোন কোন জিনিস কাজে লাগে?

১.৬ তুমি যে সব ছবি আঁকো, সেগুলো মূলত কী নিয়ে আঁকা?

১.৭ এলোমেলো হিজিবিজি ভাবনাকে আঁকা ছাড়া আর কীভাবে প্রকাশ করা যায়?

১.৮ তুমি যখন আরও ছোটো ছিলে, তখনকার একটি খাতা যদি তুমি হঠাৎ খুঁজে পাও, তবে তোমার কেমন লাগবে, তা নিজের ভাষায় লেখো।

শব্দার্থ : হিজিবিজি — জটিল, বিশৃঙ্খল।

সুনির্মল চক্রবর্তী (জন্ম ১৯৫৩) : শিশুসাহিত্যিক, ছোটোগল্পকার, গীতিকার। ছোটোদের বিভিন্ন পত্রপত্রিকার নিয়মিত লেখক। প্রকাশিত বই— ‘খাতার পাতায়’, ‘মৌরিফুল’, ‘পুঁটুরাণী’, ‘কুসুমপুরের শালিক’, ‘সাতভাই চম্পা’, ‘কলাবতী রাজকন্যা’ ইত্যাদি।

২. ঠিক বাক্যটির পাশে (✓) ও ভুলটির পাশে (×) দাও :

২.১ শিশুটি এই কবিতায় একজন শিল্পী। ☐

২.২ সারাদিন শিশুটি প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকেন। ☐

২.৩ তার আঁকার বিষয় হাতি, ঘোড়া, গাছ, পাখি ইত্যাদি। ☐

২.৪ শিশুটি স্পষ্ট জানে কেন সে ছবিটা আঁকে। ☐

২.৫ অনেক ছবি এঁকেও শিশুটির মনে স্বস্তি নেই। ☐

৩. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

৩.১ সারাদিন ছবি আঁকতে শিশুটির (ভালো লাগে/ভালো লাগে না/বিরক্ত লাগে)।

৩.২ শিশুটির আঁকার বিষয় (নানা রকম/একরকম/কয়েক রকম)।

৩.৩ শিশুটির সব ভাবনাই (হিসেবি/বেহিসেবি/নজরকাড়া)।

৩.৪ শিশুটির চিন্তা ভাবনা বুঝতে গেলে তাঁর (কথা শুনতে হবে/কবিতা পড়তে হবে/খাতা দেখতে হবে)।

৩.৫ শিশুটি তার খাতাটিকে ছেড়ে (থাকতে চায়/থাকতে চায় না/দূরে কোথাও চলে যেতে চায়)।

৪. শূন্যস্থান পূরণ করো :

৪.১ .... ভালো লাগে
নানা .... আঁকতে

৪.২ .... ভাবনারা
মনে .... যখনই

৪.৩ .... গাছ পাখি
আঁকি .... কত কী

৪.৪ এতসব .... তবু
মন .... যায় না

৪.৫ আসলে এ .... ছেড়ে
.... যেতে চায় না।
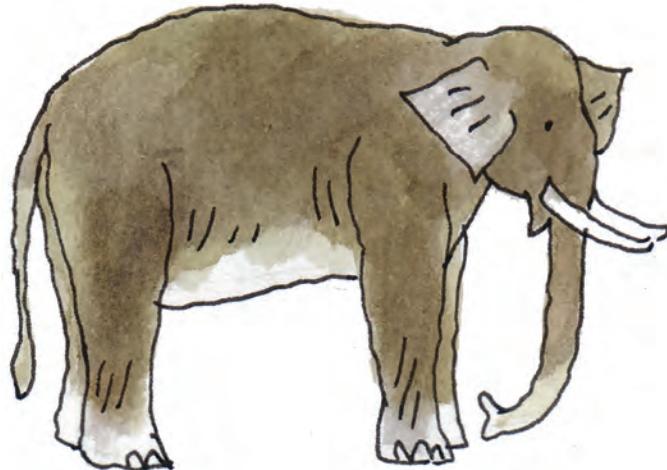
৫. এলোমেলো বর্ণগুলিকে সাজিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করো :

জি জি বি হি, দি রা ন সা, খা ম না ন, এ ব ই স, স আ ল।

৬. বর্ণ বিশ্লেষণ করো :

খাতা, আঁকি, আঁকতে, ভাবনারা।

৭. 'ক' ও 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো:

ক	খ
ঘোড়া	তুলি
খাতা	জুড়িগাড়ি
ছবি	আকাশ
পাখি	বন
গাছ	কলম
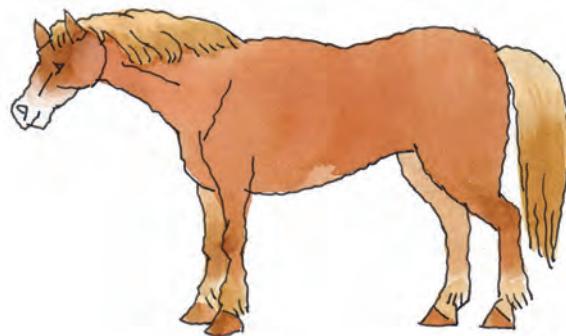
৮. নীচের শব্দগুলির যা অর্থ, কবিতাটি থেকে সেই শব্দগুলি বেছে নিয়ে লেখো :

বিচিত্র, দিবারাত্র, পৃষ্ঠা, চিত্ত, চিত্র, গজ, অশ্ব, পক্ষী, বৃক্ষ।

৯. কী বলে লেখো :

হাতির ডাক........................

ঘোড়ার ডাক........................

পাখির ডাক........................

১০. আমি আঁকি। (তুমি, সে, আর তিনি আঁকলে, কী লিখবে?)

তুমি........................।

সে...........................।

তিনি.........................।

১১. একের বেশি বোঝানো হয়েছে, এমন তিনটি শব্দ কবিতা থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :

....

১২. শব্দযুগলের অর্থ পার্থক্য দেখাও :

মন আসা

মণ আশা

১৩. 'রয়ে' ও 'ভরে' শব্দ দুটির অন্য রূপ লেখো।

১৪. নির্দেশ অনুযায়ী উত্তর দাও :

১৪.১ 'চায়' শব্দটিকে 'তাকানো' ও 'চাওয়া' এই দুটি অর্থে ব্যবহার করে দুটি বাক্য লেখো।

১৪.২ 'পাতা' শব্দটিকে দুটি অর্থে ব্যবহার করে দুটি বাক্য লেখো।

১৫. বাক্য রচনা করো :

সারাদিন, খাতা, হিজিবিজি, ছবি, মন।

১৬. বাক্য বাড়াও :

১৬.১ আমি আঁকি। (কী আঁকো?)

১৬.২ খাতাটায় রয়ে যায়। (কী, কীভাবে?)

১৬.৩ ভালো লাগে নানা ছবি আঁকতে। (কখন?)

১৬.৪ আমি জানি অত কি? (কী জানো না?)

১৬.৫ মন যেতে চায় না। (কী ছেড়ে?)

১৭. 'সারাদিন' কবিতার অনুসরণে লেখো কবির সারাটি দিন কীভাবে কাটে।

ফুল

সুখলতা রাও

অনেক অনেক কাল আগে, যখন মানুষ জন্মায়নি, তখন পৃথিবীতে ফুল ছিল না। মাটির উপর ছিল কেবল বড়ো বড়ো ঘাস আর পাতা গাছ। আলো এসে ফুলদের খুঁজে খুঁজে যেত। বাতাস পাতা শুঁকে শুঁকে চলে যেত। হায়, ফুল নেই।

এক রাতে ফুলপরিরা নেমে এল পৃথিবীর পাতা-ভরা বাগানে। তাদের দেশে নাকি অনেক ফুল। তারা ফুলের পাপড়ির পোশাক পরে, ফুলের মধু খায়। পরিরা বলাবলি করল, 'আচ্ছা, এমন চমৎকার জায়গায় ফুল নেই? চলো, আমরা ফুল নিয়ে আসি।'

বলে, তারা সকলে মিলে, তাদের দেশ থেকে অনেক ফুলের বীজ নিয়ে এল। সেই সব বীজ ছড়িয়ে দিল মাঠে মাঠে, বনে বনে। সেই বীজ থেকে গাছ গজাল। তারপর গাছে গাছে দেখা দিল নানা রঙের ফুলের কুঁড়ি। সেই কুঁড়ি ফুটল। সাদা নীল হলদে লাল বেগুনি ফুলে ছেয়ে গেল বন। আলো এসে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। বাতাস তাদের দুলিয়ে দিয়ে গেল। মৌমাছিরা ছুটে এল মধু খেতে।

এখনো নাকি ফুলপরিরা নেমে আসে পৃথিবীতে। যেখানে মানুষরা থাকে, সেখানে নয়। রাত হলে, চাঁদ উঠলে, তারা গভীর জঙ্গলের ভিতর নামে। সারা রাত ফুলবনে হাত ধরাধরি করে নাচে। ভোর না হতে চলে যায়। সকালবেলা সেখানে গেলে নাকি দেখতে পাওয়া যায়—তাদের পায়ের চাপে ঘাস শুয়ে পড়েছে। কেউ দেখেছ?
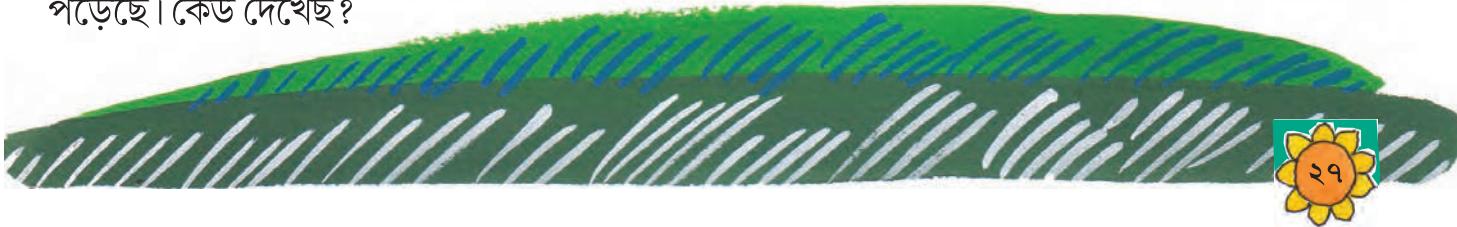
হাতে কলমে

১. পরিরা জাদু জানে। তারা ইচ্ছা করলেই অনেক কিছু বদলে ফেলতে পারে। তাদের আছে জাদুছড়ি। ধরো, তুমিও একদিন পেয়ে গেলে এমনই এক জাদুছড়ি। বদলে ফেলো তোমার অপছন্দের তিনটি জিনিস, কী কী বদলালে, লিখে রাখো :

____

____

____

২. **নীচে দেওয়া বাক্যগুলিতে কিছু শব্দ বাদ পড়েছে। পাশের শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দগুলো নিয়ে বাক্যগুলো ঠিক করে দাও :**

২.১ কাঁচা আম খেতে ________, পাকা আম ________ হয়।

২.২ নাগরদোলা বারবার ________ ওঠে, আবার ________ নামে।

২.৩ সকালবেলা সূর্য উঠলে চারিদিকে ________ আর রাতের বেলা সব ________ হয়ে যায়।

২.৪ আমি যদি দুষ্টুমি করি, সবাই আমাকে ________ বলবে, কিন্তু যদি কথা শুনি সবাই বলবে ________।

২.৫ ________ দিকে সূর্য উঠলেও ________ দিকে অস্ত যায়।

ওপরে, নীচে। পূর্ব, পশ্চিম। আলো, অন্ধকার। টক, মিষ্টি। খারাপ, ভালো।

শব্দার্থ : কাল — সময়। পরি— কল্পনার জীব, এরা জাদু জানে, এরা দেখতে মানুষের মতো হলেও এদের দুটি ডানা থাকে। পোশাক — জামা কাপড়। চমৎকার—খুব সুন্দর। ছেয়ে গেল — ভরে গেল।

৩. নীচে কতগুলো ফাঁকা জায়গা দেওয়া হলো। ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে বাক্যগুলো পূর্ণ করো :

৩.১ নানা রঙের কুঁড়ি থেকে হয় নানা রঙের _________ (ফল / পাতা / ফুল)।

৩.২ পৃথিবীর পাতাভরা বাগানে নেমে এল _________ (জলপরিরা / ফুলপরিরা / বনপরিরা)।

৩.৩ _________ (রোদ / বৃষ্টি / আলো) এসে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিত।

৩.৪ বাতাস পাতা _________ (শুঁকে শুঁকে / উড়িয়ে / ঝরিয়ে) চলে গেল।

৩.৫ এখনও নাকি ফুলপরিরা নেমে আসে _________ (চাঁদে / পৃথিবীতে / আকাশে)।

৪. ফুলের মধ্যে কিছু গুণ আছে যা অন্যকে সুন্দর করে তুলতে সাহায্য করে। নীচে গুণগুলো দিয়ে দেওয়া হলো। শব্দগুলোর ভাব বজায় রেখে নতুন বাক্য তৈরি করো (একটি করে দেওয়া হলো) :

গুণ	বাক্য
স্নিগ্ধতা	শরতের সকালে শিউলি ফুলের গন্ধে মন স্নিগ্ধ হয়ে যায়।
পবিত্রতা	
সুগন্ধ	
বর্ণময়তা	
সৌন্দর্য	

৫. দু-একটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

৫.১ কোন সময় পৃথিবীতে ফুল ছিল না বলে লেখক আমাদের জানিয়েছেন?

৫.২ যখন ফুলেরা এই পৃথিবীতে ছিল না, তখন পৃথিবীর অবস্থা কেমন ছিল?

৫.৩ ফুলপরিরা কেমন পোশাক পরে? তারা কী খায়?

৫.৪ ফুলপরিদের নিয়ে আসা বীজ থেকে যে গাছ হয়েছিল, তাতে কী কী রঙের ফুল ফুটেছিল?

৫.৫ গভীর জঙ্গলে সারা রাত ফুলপরিরা কী করে?

৫.৬ গভীর জঙ্গলেই বা তারা কেন নেমে আসে?

৬. এই গল্পে বলা হয়েছে পরিরা কীভাবে পৃথিবীতে ফুল ফোটাল। তুমি তোমার নিজের ভাষায় সেই ঘটনাটি লেখো।

৭. **কোন ঋতুতে কী কী ফুল ফোটে তা নীচের ছকে লেখো :**

গ্রীষ্ম	বর্ষা	শরৎ	হেমন্ত	শীত	বসন্ত

সুখলতা রাও (১৮৮৬ - ১৯৬৯) : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা। রায়চৌধুরী পরিবারের সাংস্কৃতিক আবহাওয়াতে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা বিকশিত। ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই বহু বই লিখেছেন। তাঁর ‘আরো গল্প’, ‘খোকা এল বেড়িয়ে’, ‘নতুন ছড়া’ প্রভৃতি বই বাংলা শিশুসাহিত্যের সম্পদ।

৮. **একই অর্থের শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :**

বসুধা, মৃত্তিকা, বায়ু, বৃক্ষ, অলি, তৃণ।

৯. **‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো :**

ক	খ
ফুল	রাত
পরি	মধু
বাগান	পোশাক
পাপড়ি	গাছ

১০. **বর্ণবিশ্লেষণ করো :**

পৃথিবী, চমৎকার, মৌমাছি, জঙ্গল, মানুষ।

১১. **কটি বাক্য খুঁজে পেলে লেখো :**

অনেক অনেক কাল আগে, যখন মানুষ জন্মায়নি, তখন পৃথিবীতে ফুল ছিল না। মাটির উপর ছিল কেবল বড়ো বড়ো ঘাস আর পাতা গাছ। আলো এসে ফুলদের খুঁজে খুঁজে যেত। বাতাস পাতা শুঁকে শুঁকে চলে যেত। হায়, ফুল নেই।

১২. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**

রাত, বড়ো, আগে, যেত, অনেক।

১৩. কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুযায়ী পাশেপাশে বাক্য লেখো :

১৩.১ পরিরা দুঃখে চলে যেত।

১৩.২ চলো, আমরা ফুল নিয়ে আসি।

১৩.৩ ঘাস শুয়ে পড়েছে।

১৪. নীচের সূত্রগুলি কাজে লাগিয়ে শব্দছকটি পূরণ করো :

১.			২.		
	৩.	৪.		৫.	
৬.		৭.	৮.		
৯.			১০.		

পাশাপাশি

১. আকাশ, নদী, গাছপালা-সহ আমাদের চারপাশ।

৩. বৃক্ষ বিশেষ।

৫. মৌমাছির আরেক নাম।

৭. ছয় ঋতুর মধ্যে সবার শেষে আসে।

৯. আমরা সবাই মিলে..... বেঁধে খেলতে যাই।

১০. পরিরা খুশি হলে যা দেয়।

উপর-নীচ

১. এরা কল্পনা-রাজ্যের বাসিন্দা।

২. খুব জোরে হলে কানের পর্দা ফেটে যায়।

৪. এর মধ্যেও ফুলগাছ লাগানো হয়।

৫. মন বা..........সর্বদা পবিত্র রাখতে হয়।

৬. সূর্য-ও মামা........-ও মামা।

৮. 'পাখি......করে রব, রাতি পোহাইল'

সমাধান :

পাশাপাশি : ১. পরিবেশ, ৩. বট, ৫. অলি, ৭. বসন্ত, ৯. দল, ১০. বর

উপর-নীচ : ১. পরি, ২. শব্দ, ৪. টব, ৫. অন্তর, ৬. চাঁদ, ৮. সব

আজ ধানের ক্ষেতে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান
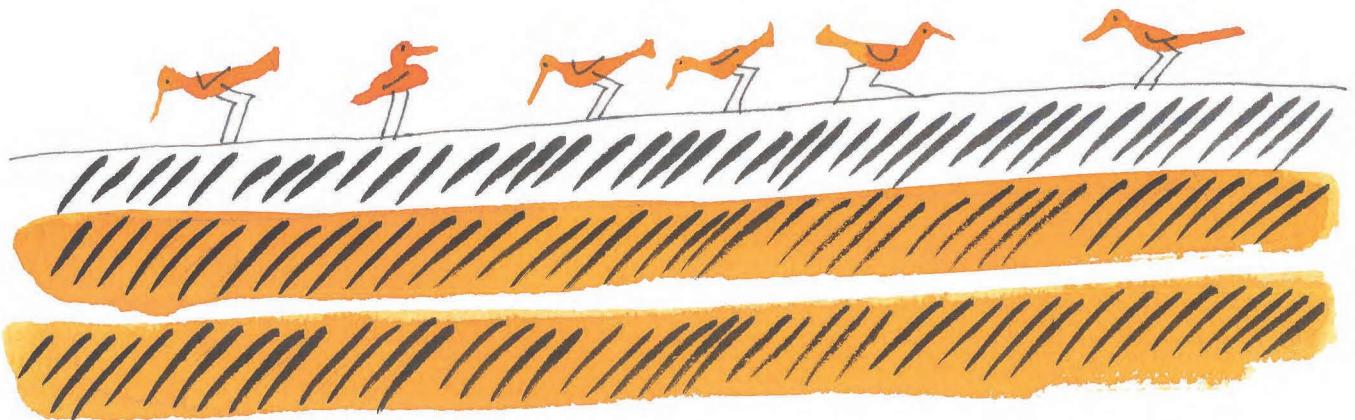
আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা—
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই — লুকোচুরি খেলা।।
আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে — উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে
আজ কীসের তরে নদীর চরে চখা-চখীর মেলা।।

ওরে, যাব না আজ ঘরে রে ভাই, যাব না আজ ঘরে।
ওরে, আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুট করে।
যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : বাংলাভাষার অন্যতম প্রধান গীতিকার এবং সুরকার। তাঁর রচিত গানগুলি 'গীতবিতান' নামের বইতে কয়েক খণ্ডে বিধৃত রয়েছে। আর গানগুলির স্বরলিপি বিভিন্ন খণ্ডে রয়েছে 'স্বরবিতান' নামের বইয়ে। এই গানটি 'প্রকৃতি' পর্যায়ভুক্ত।
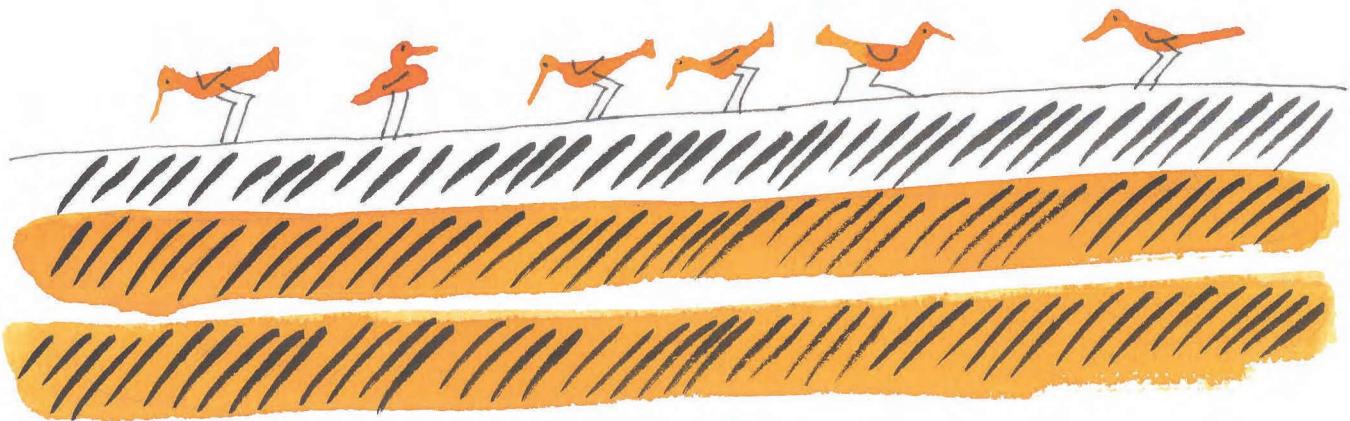
সোনা

গৌরী ধর্মপাল

চাষির মেয়ে সোনা। চাষির ঘর আলো করে উঠোনে হামাগুড়ি দেয়। একটুখানি জায়গা মায়ে-বাপে বেড়া দিয়েছে, যাতে বাইরে বেরিয়ে না যায়। নরম লতা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে, পাছে মেয়ের হাতে-পায়ে লাগে।

সোনা একটু বড়ো হয়েছে। মা ভাবে, সোনার হাতে দু-খানি কাঁকন দিলে বড্ড মানাত। তা কোথায় পাবে বলো? সোনার যা দাম! তা ছাড়া চুরির ভয় আছে না?

আছে। সোনা উঠোনে খেলা করে। গায়ের সোনায় রোদ লেগে ঠিকরোয়। গাঁ-সুদ্ধ সবাই দেখে আর আশ্চয্যি মানে। মা ঘরের পাট সারতে সারতে চোদ্দোবার এসে দেখে যায়।

একদিন সোনাকে নিয়ে নদীতে নাইতে গেছে বাপ-মায়ে। নাইয়ে ধুইয়ে গা মুছিয়ে দিতে যাবে কী, দেখে, মেয়ের গায়ে বালি চিকচিক করে। কত মুছলে, কত ঝাড়লে, সে বালি আর কিছুতেই ঝরে না। তখন ভালো করে নিরীক্ষণ করে চাষি বললে, অ বউ, এ তো বালি নয়, এ যে দেখছি সোনা! তুই মেয়ের হাতে কাঁকন দিতে চাইছিলি। তা নদীমা তোর মেয়ের সারা গায়ে গয়না পরিয়ে দিয়েছেন।

অ্যাঁ, তাই নাকি? বলে মেয়েকে আঁচল দিয়ে ঢেকেঢুকে চাষি-বউ বাড়ি নিয়ে এল।

একদিন। বাবা গেছে ক্ষেতে, মা রান্নাঘরে দুধ জ্বাল দিচ্ছে, দুধ উথলোব-উথলোব করছে। সোনা উঠোনে একা। এক চোর—এতদিন ধরে তক্কে তক্কে ছিল—এসে সোনাকে তুলে নিয়ে চম্পট। মা দুধ খাবার জন্যে ডাকতে এসে দেখে, মেয়ে নেই। কখন কী হয় ভেবে চাষি এক ঘণ্টা বেঁধে দিয়েছিল ঘরের মধ্যে। সেইটি ধরে মা পাগলের মতো বাজাতে লাগল—ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং—সারা গাঁ ছুটে এল। তারপর হাতের কাছে যে যা পেল নিয়ে ছুটল চোর ধরতে।

চোর ওদিকে সোনাকে নিয়ে হনহনিয়ে যাচ্ছে। বড়ো রাস্তায় পড়েই দেখে কী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দু-তিনটে গাড়ি আসছে। হঠাৎ সামনের গাড়ি থেকে একজন চেঁচিয়ে বললে, আরে ওই তো। সব ক-টা গাড়ি একসঙ্গে ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল। দু-তিন জন একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ে চোরকে ধরে ফেললে। চোর বললে, এ তো আমার মেয়ে। বড্ড কান্নাকাটি করছিল, তাই বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছিলুম। গাঁয়ের লোকেরা পেছন থেকে গর্জন করে বললে—মিথ্যে কথা। চাষিও ততক্ষণে ভিড় দেখে ক্ষেত থেকে ছুটে এসেছে। সোনা বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চাষি বললে, আপনারা?

—আমরা সরকারের লোক। আপনার মেয়ের কথা শুনে যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছি, নদীতে সোনা খুঁজতে।

—খুঁজুন।

লোকেরা গাড়ি করে সোনা আর সোনার বাবাকে পৌঁছে দিয়ে যন্ত্রপাতি বসিয়ে নদীতে সোনা খুঁজতে লেগে গেল।

সেই থেকে সেই গাঁয়ের নাম হলো সোনারগাঁ।

সরকারের লোকেরা নদীর জলে সোনা পেল বটে, কিন্তু এত কম যে তোলা পোষাবে না।

পাততাড়ি গুটিয়ে তাঁবু উঠিয়ে যেদিন তারা চলে গেল, গাঁয়ের লোক হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। নদীমাও হাঁপ ছাড়লেন। খোঁড়াখুঁড়িতে এতদিনের ময়লা বেরিয়ে তলাটা পরিষ্কার হয়ে গেল কিনা। তা ছাড়া বুঝতেই পারছ, বুকের ওপর দম আটকানো নল বসানো, ইঞ্জিনের আওয়াজ—ও কি কারও ভালো লাগে? বলো? মন খুলে স্রোতের আঁচল দুলিয়ে কুলকুল করে বইতে লাগলেন আর দু-কূল ভরে ফসল ফলাতে লাগলেন।

সোনা আরও বড়ো হয়েছে। পাঠশালের উঁচু ক্লাসে পড়ে। সংস্কৃতের দিদিমণি নাম রেখেছেন নদীমাতৃকা। নদীমাতৃকা বন্ধুদের নিয়ে নদীতে সাঁতার কাটে ওবেলা একঘণ্টা, এবেলা একঘণ্টা। বন্ধুরা বলে, আমরাও তো সাঁতার জানি। কিন্তু তুই যেন জলের মাছ। নদীমা হিরণ্যবক্ষা ঢেউ দুলিয়ে হাসেন। সোনার হাতে-গলায় সোনা চিকচিক করে।

আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার শোনো। নদীকে কেউ নোংরা করলে সোনা ঠিক টের পায় যেখানেই থাকুক। বাঘিনির মতো ছুটে আসে। একজনকে তো আধমরা করে ছেড়েছিল। আর একজন কারখানা বসিয়েছিল। হু হু করে নোংরা জল পড়ছিল নদীতে। সোনা সবাইকে নিয়ে ধরনা দিয়ে বন্ধ করিয়ে ছাড়ল। সেই থেকে সোনারগাঁ-এর লোকেরা কেউ নদীকে নোংরা করে না। ভিনগাঁয়ের লোকেরা এসে বলে, বাঃ, তোমাদের এখানে নদী তো বেশ পরিষ্কার। আমাদের ওখানে এই নদীই যেন নর্দমা।

সোনা বলে, নদী যে মা, সত্যিকারের মা। শুধু কি জল? জল-কে-জল। দুধ-কে-দুধ! দেখনি, ধানের বুকে টসটস করে? মায়ের দুধ খাও আর মায়ের গায়ে কাদা ছোঁড়ো, তোমরা কী? মানুষ না পিশাচ?

হাতে কলমে

১. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

১.১ সোনা কে? তার বাবা-মা কেন বাড়িতে বেড়া দিয়েছেন?

১.২ নদীমা কীভাবে সোনার সারা গায়ে গয়না পরিয়ে দিয়েছিলেন?

১.৩ চোরটি সোনাকে কখন চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল?

১.৪ কেন গ্রামটির নাম হলো 'সোনারগাঁ'?

১.৫ সরকারের লোকেরা কী কাজ করবে বলে সোনাদের গ্রামে এসেছিল?

১.৬ কে সোনার নাম রেখেছিল নদীমাতৃকা? এই নামের অর্থ কী?

১.৭ কেউ নদীর জল নোংরা করলে সোনা কী করত?

২. নদী আমাদের কী কী উপকার করে?

৩. এই গল্প থেকে এমন তিনটি বাক্য খুঁজে নিয়ে লেখো যেখানে 'সোনা' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

---

৪. ভারতবর্ষ 'নদীমাতৃক' দেশ। এখানে অনেক নদী আছে। নদীকে মায়ের মতন কেন বলা হয়?

৫. তোমার জানা তিনটি নদীর নাম লেখো।

৬. **শব্দগুলো সাজিয়ে বাক্য গঠন করো :**

৬.১ বড়ো হয়েছে একটু সোনা।

৬.২ ছাড়লেন নদীমা-ও হাঁপ।

৬.৩ ক্লাসে পাঠশালের উঁচু পড়ে।

৬.৪ সোনারগাঁ হলো সেই নাম সেই থেকে গাঁয়ের।

৬.৫ চিকচিক বালি মেয়ের করে গায়ে।

শব্দার্থ : আশ্চয্যি — অবাক। নাইতে—স্নান করতে। নিরীক্ষণ—ভালো করে দেখা, পরীক্ষা করা। চম্পট—পালিয়ে যাওয়া। গর্জন—রেগে গিয়ে আওয়াজ করা । নদীমাতৃকা—নদী যার মায়ের মতন। হিরণ্যবক্ষা— যার বুকে সোনা থাকে। পিশাচ—দৈত্য।

৭. এলোমেলো বর্ণ সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

কুকুলল —
কেঢুঢেকে —
মাড়িগুহা —
ক্ষততণে —
লসফ —
মদিণিদি —
তাড়িতপা —
কারসর —

৮. শূন্যস্থান পূরণ করো :

৮.১ চাষির ঘর আলো করে উঠোনে ________ দেয়।

৮.২ গায়ের ________ রোদ লেগে ঠিকরোয়।

৮.৩ তুই মেয়ের হাতে ________ দিতে চাইছিলি।

৮.৪ সংস্কৃতের দিদিমণি নাম রেখেছেন ________ ।

৮.৫ আপনার মেয়ের কথা শুনে ________ নিয়ে এসেছি।

৯. 'সোনা' শব্দটি নীচের বাক্যগুলিতে কোথায় ব্যক্তি আর কোথায় বস্তু বোঝাচ্ছে লেখো :

৯.১ চাষির মেয়ে সোনা।

৯.২ মা ভাবে, সোনার হাতে দু-খানি কাঁকন দিলে বড্ড মানাত।

৯.৩ সোনার যা দাম!

৯.৪ গায়ের সোনায় রোদ লেগে ঠিকরোয়।

৯.৫ এ যে দেখছি সোনা!

৯.৬ সোনার হাতে-গলায় সোনা চিকচিক করে।

গৌরী ধর্মপাল (জন্ম ১৯৩১): সংস্কৃতের বিখ্যাত অধ্যাপক। ছোটোদের জন্য লেখালেখি করেছেন সারাজীবন, ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর বইগুলির কয়েকটি— 'ঘোড়া যায়', 'চোদ্দো পিদিম', 'আশ্চর্য কৌটো', 'চাঁদনি', 'কালো মানিক'। ছোটোদের জন্যই অনুবাদ করেছেন 'মালশ্রীর পঞ্চতন্ত্র' আর বিদেশি রূপকথার অনুবাদ 'আটটি আপেল'।

১০. একই অর্থের শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :

অন্যগ্রাম, কনক, তটিনী, কঙ্কন, নীর, নির্মল।

১১. গল্পের ঘটনাক্রম সাজিয়ে লেখো :

১১.১ এক চোর এসে সোনাকে তুলে নিয়ে চম্পট।

১১.২ সরকারের লোক যন্ত্রপাতি বসিয়ে সোনা খুঁজতে লেগে গেল।

১১.৩ সোনারগাঁ-র লোকেরা কেউ নদীকে নোংরা করে না।

১১.৪ নদীমা তোর মেয়ের গায়ে গয়না পরিয়ে দিয়েছেন।

১১.৫ সোনা বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

১২. বিপরীতার্থক শব্দ :

গাঁ, উঁচু, এক, সামনে, মিথ্যে।

১৩. বর্ণ বিশ্লেষণ করো :

কাঁকন, পরিষ্কার, চম্পট, যন্ত্রপাতি, নদীমাতৃকা, হিরণ্যবক্ষা।

১৪. কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করে পাশাপাশি বাক্য লেখো :

১৪.১ মেয়েকে আঁচল দিয়ে ঢেকেঢুকে চাষি-বউ বাড়ি নিয়ে এল।

১৪.২ মা পাগলের মতো বাজাতে লাগল — ঢং ঢং ঢং...।

১৪.৩ আপনার মেয়ের কথা শুনে যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছি।

১৪.৪ তুই যেন জলের মাছ।

১৫. বাক্য রচনা করো :

হামাগুড়ি, হনহনিয়ে, ইঞ্জিন, অদ্ভুত, পিশাচ।

১৬. বাক্য বাড়াও :

১৬.১ একটুখানি জায়গা মায়ে-বাপে বেড়া দিয়েছে। (কেন?)

১৬.২ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দু-তিনটে গাড়ি আসছে। (কোথা দিয়ে?)

১৬.৩ যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছি। (কেন?)

১৬.৪ সোনা ঠিক টের পায় যেখানেই থাকুক। (কী টের পায়?)

১৬.৫ ভিনগাঁয়ের লোকেরা এসে বলে। (কী বলে?)

১৭. নদীতে কোন কোন প্রাণী বাস করে? সাঁতার কাটতে পারে কোন পাখি?

১৮. 'সোনা' গল্পটি থেকে তোমরা কী শিখলে তা লেখো। গল্পটির আর একটি নাম দাও ।

১৯. নীচের সূত্রগুলি কাজে লাগিয়ে শব্দছকটি পূরণ করো :

১.		২.		৩.	
				৪.	৫.
৬.			৭.		
		৮.			
৯.				১০.	
			১১.		

উপর-নীচ

১. এখানে মাথা রেখে ঘুমোতে আরাম।
২. জলের জীব।
৩. এর উপরেই লিখতে হয়।
৫. ....মোর মেঘের সঙ্গী।
৭. কোকিলের ডাক।
৮. ....জঙ্গল।
১০. বৃষ্টি হলে প্রয়োজন।

পাশাপাশি

১. নদী যার মায়ের মতন।
৪. ধান ও .... আমাদের প্রধান খাদ্য।
৬. "মামাবাড়ি ভারি.......,কিল চড় নাই।"
৭. মন্দ লোক।
৮. অনেক।
৯. শ্রুত.............।
১১. ....না জানলে জলে নামা উচিত নয়।

শব্দছকের উত্তর :

উপর-নীচ : ১. নরম বালিশ, ২. মাছ, ৩. কাগজ, ৫. মন, ৭. কুহু, ৮. বন, ১০. ছাতা

পাশাপাশি : ১.নদীমাতৃকা, ৪. গম, ৬. মজা, ৭. কুজন, ৮. বহু, ৯. লিখন, ১১. সাঁতার

নদী শক্তি চট্টোপাধ্যায়

নদী নদী নদী
সোজা যেতিস যদি
সঙ্গে যেতুম তোর
আমি জীবনভর।

তা নয়, গেলি বেঁকে
সোজা সহজ পথের থেকে।
আমায় বাঁকতে করে মানা
পথে- ঘাটেরই দশজনায়।
ভালো তো নয় বাঁকা
সোজা সহজ পথের থেকে।

নদী নদী নদী
সোজা যেতিস যদি
সঙ্গে যেতুম তোর
আমি জীবনভর।।

হাতে কলমে

শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৯৫) : বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কবি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হে প্রেম, হে নৈঃশব্দ্য'। এছাড়াও 'ধর্মে আছি, জিরাফেও আছি', 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান', 'সোনার মাছি খুন করেছি', 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব' উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। 'কুয়োতলা', 'অবনী বাড়ি আছো?' বিখ্যাত উপন্যাস। তিনি 'আনন্দ পুরস্কার' এবং 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার' পেয়েছেন।

১. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১.১ নদীর কথা বললে প্রথমেই তোমার কোন নদীর নাম মনে আসে?

১.২ নদী থেকে আমরা কোন কোন জিনিস পাই?

১.৩ নদীতে চলে এমন কয়েকটি যানবাহনের নাম লেখো।

১.৪ নদীতে পাওয়া যায় এমন কয়েকটি মাছের নাম লেখো।

১.৫ নদীর উপর সেতু তৈরি করা হয় কেন?

২. নীচে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি নদীর নাম দেওয়া হলো। নদীগুলি কোথায় তা শিক্ষিকা / শিক্ষকের থেকে জেনে নিয়ে লেখো।

ভাগীরথী	তিস্তা	সুবর্ণরেখা	দামোদর	রূপনারায়ণ	রায়মঙ্গল	কংসাবতী
অজয়	ইছামতী	জলঢাকা	তোর্সা	গন্ধেশ্বরী	গোসাবা	চূর্ণি

৩. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

৩.১ কবিতায় কবির মনের ইচ্ছাটি কী?

৩.২ সেই ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি চলতে পারলেন না কেন?

৩.৩ নদী কীভাবে তার চলার পথে এগিয়ে চলে?

নদীর তীরে একা

জীবন সর্দার

অনেক নদীর তীরে আমি একা একাই গিয়েছি। কেন? এ প্রশ্নের উত্তর একটাই—প্রকৃতি-পড়ুয়া হব বলে। তবে নদীর তীরে গিয়ে বসে থাকিনি, শুধু ঢেউয়ের ওঠানামা দেখিনি, ওই নদী কেমন নদী, সেই খোঁজ নেওয়া ছিল আমার খেলা। ছিল কেন বলছি, এখনও আমি ফুরসত পেলে, একটা না একটা, নদীর তীরে যাই।

এবার বর্ষায় বৃষ্টি হয়েছে কম। কিন্তু শরতে পর পর কদিন ঝমঝম বৃষ্টি হতেই নদীরা রং পালটে নিল। আমার প্রিয় নদী তিনটিকে একটু ভরা ভরা দেখলাম। ইছামতীর তীরে বসার সুযোগ ছিল না, তাই পশ্চিমে দামোদরের তীরে, আমার প্রিয় ঘাট 'খাদিনানের' পথে পাড়ি দিলাম। ওই ঘাটে যাবার দুটি পথ। একটি বাঁধের উপর দিয়ে। হেঁটে। অন্যটি নৌকোয়। আমি হেঁটে যাওয়া ভালোবাসি আর সেটা হবে জলের কিনার ধরে।

কিন্তু সেদিন মহিষরেখা ঘাটে একটা ডিঙি পেয়ে গেলাম। সেই ডিঙির মাঝিকে আমি খুব চিনি। সে বলল 'এবার কী মনে করে? চৈত্র মাসেই তো এসেছিলেন।' 'তখন ছিল শুকনো কাল। দামোদরের তখন অন্য রূপ। তার তীর ধরে সবজি ফসল ছিল দেখার মতো। আর এখন জল-ভরা নদী দেখতে এসেছি', আমার উত্তর সোজা।

দামোদরের উপর বম্বে রোডের পুলের কাছে মহিষবাথান। আমার পক্ষে সেখানে পৌঁছে যাওয়া কঠিন নয়। তাই একই নদীকে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে দেখতে যাই। দেখে দেখে শিখি নদীর নানান রকম দশা।

ডিঙিতে বসে মাঝিকে বললাম 'মনু, নৌকো খুলতে হবে না। এসো বসি। দুজনে নদীর কথা বলি।' মনু আমার মুখোমুখি বসল। বললাম—'দামোদরে এখন জোয়ার ভাটা খেলে না? রূপনারান, ইছামতী—দুই নদীতে জল বাড়ে কমে। জোয়ার-ভাটা হয়।'

'ভাটা তো লেগেই আছে। উপরে বাঁধের জল ছাড়লেই হৈ হৈ করে জল নেমে আসে। নইলে ভাটায় ঢিলা থাকে। কিন্তু জোয়ারের জল কেরামতি দেখাতে পারে না।'

'কেন?'

'কেন আবার! নদীর মুখে গেট আছে না। ওই গেট দিয়ে গঙ্গার জল আসা যাওয়া ঠিক হয়।'

'ঠিক, তা দেখেছি আমি। কিন্তু তাতে অসুবিধা কী। চাষের কাজ, মাছ ধরার কাজ এসব তো কমতি হয় না।'

মনু চুপ করে আমার কথা শুনছিল। আমার নজরে পড়ল একটা সাদা কালো মাছরাঙা। ফটকা। চুপচাপ নদীর উপর ঝুঁকে থাকা একটা গাছের ডালে এসে বসল সেটা।

'মনু', আমি প্রশ্ন করলাম, 'নদীর ধারের পাখিদের দেখছি না তো! কোথায় গেল সব?'

'কী পাখি?' উলটো প্রশ্ন তার।

'শীতের সময় সময় খঞ্জন আসবে। এখন ওটার দেখা পাবে না। কাদাখোঁচা, সেগুলো হয়তো শীত পড়তে না পড়তেই হাজির হবে। কিন্তু বালিহাঁস এদিকে শীতেও দেখবে না।'

'কেন? আমি তো রূপনারানের চড়ায় কার্তিক মাসেই সরাল দেখেছি।'

‘সরাল হয়তো দেখতে পাবে এদিকে। আর কদিন পরেই। রাতের বেলা ঝাঁক বেঁধে যায়। কিন্তু চখা কিংবা বড়ো জাতের হাঁস চরে না গেলে দেখা যাবে না।’

মনুর অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে বেশি। আমিও দমবার পাত্র নই। বললাম, ‘এই বছরই দামোদরের চরে চখা দেখেছি।’ অবাক সে। বলল ‘কোথায়?’

‘দামোদরের চরে—ওই যে আসানসোল থেকে আদ্রা যাবার লাইনে দামোদরের উপর দামোদর ইস্টিশন সেখানে। নদী খুব চওড়া বটে, তবে জল নেই। তার চড়ায় চখা দেখেছি, কাদাখোঁচা দেখেছি। মেছো বক দেখেছি।’

মনু আমার কথা শুনে হেসে ফেলল।

‘এক নদীর অনেক রকম হয়। যেখানে যেমন মাটি তেমন তার দশা।’

আমাকে চমকে দিয়ে নৌকো খুলে দিল মনু। এবার তীরের গাছপালা, মাটির রং, এমনকি বছর বছর পলি জমে যে স্তর পড়েছে তার দেখা পাব। এখানে এই নদীর তীরে আটকে থাকা শামুক-গেঁড়ি-গুগলির খোলস দেখতে পাব। এবার ওপারের পাখির, প্রজাপতির চলাচল দেখতে পাব। এখন আর কথা নয়, শুধু এক মনে দেখা।

হাতে কলমে

১. **নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও :**

১.১ প্রকৃতি বলতে কী বোঝো?

১.২ প্রকৃতি যে উপাদান বা জিনিসগুলি নিয়ে গড়ে ওঠে তার কয়েকটি নীচে দেওয়া হলো। কয়েকটি নিজে লেখো। একজন প্রকৃতি পড়ুয়া হিসেবে তুমি এর কোন কোন উপাদান পর্যবেক্ষণ করে কী কী জেনেছ আর শিখেছ, তা লেখো :

উপাদান	কী কী জানি আর শিখি
গাছপালা বাতাস পাহাড়-পর্বত নদী খোলা মাঠ	

২. আমাদের দেশে ছয়টি ঋতু আছে। প্রতিটি ঋতুর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নীচের বাক্স থেকে সেগুলি বেছে নিয়ে ঠিক ঋতুর পাশে বসাও :

গ্রীষ্ম

বর্ষা

শরৎ

হেমন্ত

শীত

বসন্ত

- এখন ঠান্ডা পড়তে আর অল্পই দেরি
- চাতকপাখি ডাকছে 'ফটিকজল'
- চারদিকের আবহাওয়া খুব মনোরম
- কদিন থেকে গুটিবসন্তের প্রকোপ দেখা দিয়েছে
- গাছের সব পাতা ঝরে যাচ্ছে
- বাইরে ফুরফুরে দখিনা হাওয়া বইছে
- ঝমঝম করে বৃষ্টি এলো
- সাদা সাদা কাশ ফুলে মাঠ ভরে গেছে
- পথে-ঘাটে খুব কাদা জমেছে
- আকাশে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ দেখা যাচ্ছে
- নদী-নালার জল শুকিয়ে গেছে
- আজ সোয়েটার গায়ে দিতেই হবে

৩. **বাক্য রচনা করো:**

হাজির ______________________________।

চওড়া ______________________________।

নৌকো ______________________________।

রং ______________________________।

প্রজাপতি ______________________________।

৪. তোমরা যে গদ্যটি পাঠ করলে, তাতে কিছু নদী এবং পাখির নাম পেয়েছ। সেগুলো খুঁজে বের করে নীচের তালিকায় লেখো:

নদী	**পাখি**

৫. তুমি প্রকৃতির কোলে পুরো একটা দিন কাটানোর সুযোগ পেলে কোন জায়গাটি বেছে নেবে? তোমার পছন্দের জায়গার পাশে (✓) দাও:

গভীর জঙ্গল ☐ নদীর ধার ☐ ফুল-ফলের বাগান ☐ পাহাড়ের কোল ☐

- সেখানে সারাদিন কীভাবে কাটাবে ছয়টি বাক্যে লেখো:

____

____

____

____

____

____

শব্দার্থ : প্রকৃতি— আমাদের চারপাশের গাছপালা, মাটি, পশুপাখি, পাহাড়, নদী সব কিছুকে একসঙ্গে বলে পরিবেশ বা প্রকৃতি। **প্রকৃতি পড়ুয়া**— প্রকৃতিকে চিনতে, বুঝতে, জানতে ও আপন করে নিতে ভালোবাসে যারা। **জোয়ার-ভাটা**— নদীর জল চাঁদের অবস্থানের জন্য বেড়ে গেলে হয় জোয়ার আর কমলে হয় ভাটা। **সরাল**— বকের মতো এক ধরনের পাখি। **ডিঙি** — ছোটো নৌকো।

৬. ফাঁকা ঘরে ঠিক শব্দ বসাও:

৬.১ নৌকোয় বসে দেখি মাঠে গরু ______আর ছেলেরা ______ গাছে। (চরছে/চড়ছে)

৬.২ প্রতিদিন______করে নদীর ধারে যাই জোয়ারের জল______ দেখব বলে। (আসা/আশা)

৬.৩ আমিও দমবার পাত্র______, মনুও_______। (নয়/নই)

৬.৪ বহুদিন পরে______য় ফিরে______ জুড়িয়ে গেল। (গাঁ/গা)

৬.৫ কোনো ______না মেনে ______পাখিটিকে উড়িয়ে দিয়েছি। (বাঁধা/বাধা)

৬.৬ ______র চুড়ির আওয়াজ______গেল। (শোনা/সোনা)

৭. একই অর্থের শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :

সেতু, ছোটো নৌকো, বদলে, কূল, নির্মোক।

৮. নীচের বাক্যগুলি থেকে কাজ, ব্যক্তি, বস্তু, গুণ আলাদা করে লেখো :

৮.১ যেখানে যেমন মাটি তেমন তার দশা।

৮.২ আমি ফুরসত পেলে, একটা না একটা নদীর তীরে যাই।

৮.৩ সেগুলো হয়তো শীত পড়তে না পড়তেই হাজির হবে।

৮.৪ তার চড়ায় চখা দেখেছি, কাদাখোঁচা দেখেছি।

৮.৫ দামোদরে এখন জোয়ার-ভাটা খেলে না।

জীবন সর্দার (জন্ম ১৯৩৫) : সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন সর্দার ছদ্মনামে লেখেন। ছাত্রজীবন থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নদী-নালা, পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে প্রকৃতির পাঠ নিতে থাকেন এবং একই সঙ্গে শুরু করেন ছোটোদের জন্য লেখালিখি। সত্যজিৎ রায়ের ডাকে জীবন সর্দার ছদ্মনামে 'সন্দেশ' পত্রিকায় শুরু করেন ধারাবাহিক 'প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর'। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই 'পাখি সব', 'পাখির কাহিনী', 'প্রাণী ও প্রকৃতি' এবং 'প্রকৃতির আঙিনায়'। পেয়েছেন রাজ্য সরকারের 'গোপাল ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার'।

৯. বর্ণ বিশ্লেষণ করো :

নৌকো, সরাল, ইস্টিশন, প্রজাপতি, চৈত্র।

১০. এলোমেলো বর্ণ সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :

দা খোঁ কা চা, সা কা দা লো, ষ থা ম বা ন হি, ঠা না ও মা, রা তি কে ম।

১১. বাক্য বাড়াও :

১১.১ সেই খোঁজ নেওয়া ছিল আমার খেলা। (কীসের খোঁজ?)

১১.২ দুজনে নদীর কথা বলি। (কোন কোন নদী?)

১১.৩ খঞ্জন আসবে। (কখন?)

১১.৪ চরে না গেলে দেখা যাবে না। (কী?)

১১.৫ চলাচল দেখতে পাব। (কাদের?)

১২. বাক্য সাজিয়ে লেখো :

১২.১ সেই মাঝির ডিঙি খুব চিনি আমি ভালো ।

১২.২ সাদাকালো নজরে আমার একটা মাছরাঙা পড়ল।

১২.৩ আমার সেখানে কঠিন নয় পক্ষে পৌঁছে যাওয়া।

১২.৪ প্রজাপতির পাব দেখতে চলাচল।

১২.৫ জল নেই তবে, খুব চওড়া নদীতে বটে।

১৩. দু-এক কথায় উত্তর দাও :

১৩.১ লেখকের প্রিয় তিনটি নদী কী কী ?

১৩.২ এখানে তাঁর প্রিয় ঘাটের কথাও রয়েছে। ঘাটটির নাম কী ?

১৩.৩ লেখক কার নৌকোয় উঠলেন?

১৩.৪ জোয়ার-ভাটা বলতে কী বোঝো?

১৩.৫ লেখক কেন দামোদরের তীরে এসেছেন?

নৌকাযাত্রা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মধু মাঝির ওই যে নৌকাখানা
 বাঁধা আছে রাজগঞ্জের ঘাটে—
কারো কোনো কাজে লাগছে না তো,
 বোঝাই-করা আছে কেবল পাটে।
আমায় যদি দেয় তারা নৌকাটি
আমি তবে একশোটা দাঁড় আঁটি,
পাল তুলে দিই চারটে পাঁচটা ছটা—
 মিথ্যে ঘুরে বেড়াই নাকো হাটে,
 আমি কেবল যাব একটিবার
 সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।
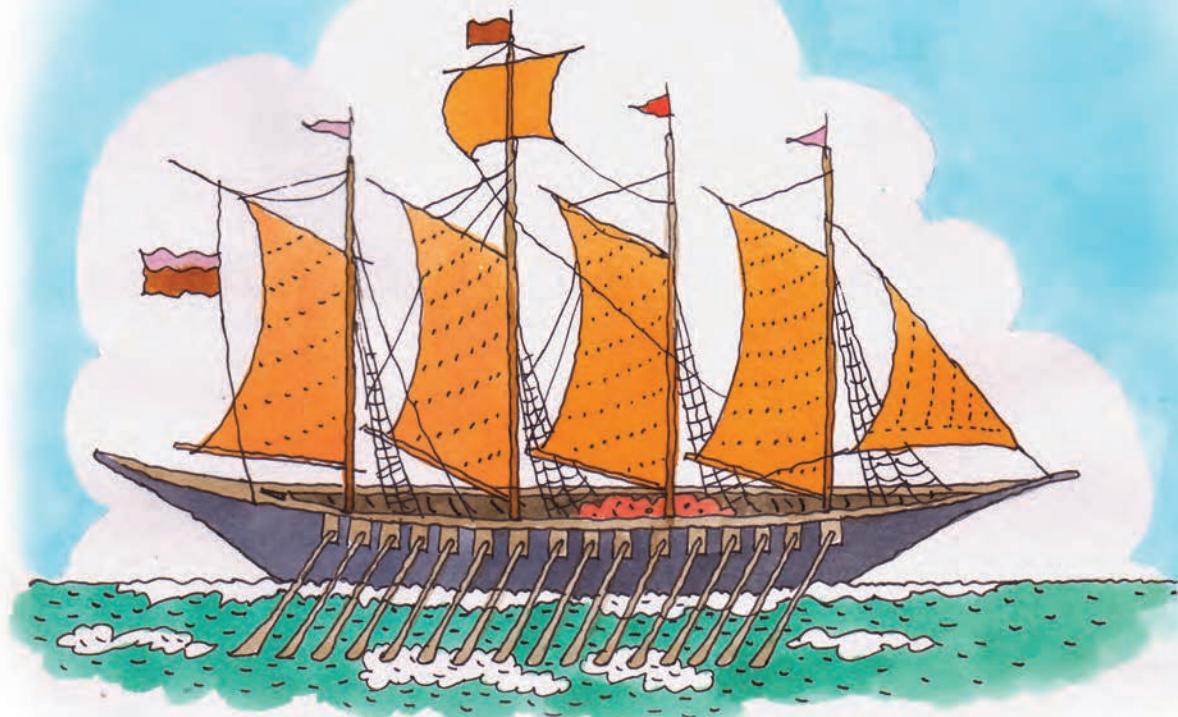
তখন তুমি কেঁদো না মা, যেন
বসে বসে একলা ঘরের কোণে।
আমি তো মা, যাচ্ছি নাকো চলে
রামের মতো চোদ্দো বছর বনে।
আমি যাব রাজপুত্রু হয়ে
নৌকা-ভরা সোনা মানিক বয়ে,
আশুকে আর শ্যামকে নেব সাথে,
আমরা শুধু যাব মা, তিন জনে।
আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।

ভোরের বেলা দেব নৌকা ছেড়ে,
দেখতে দেখতে কোথায় যাব ভেসে।
দুপুরবেলা তুমি পুকুর-ঘাটে,
আমরা তখন নতুন রাজার দেশে।
পেরিয়ে যাব তিরপূর্ণির ঘাট,
পেরিয়ে যাব তেপান্তরের মাঠ,
ফিরে আসতে সন্ধে হয়ে যাবে—
গল্প বলব তোমার কোলে এসে।
আমি কেবল যাব একটিবার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।

হাতে কলমে
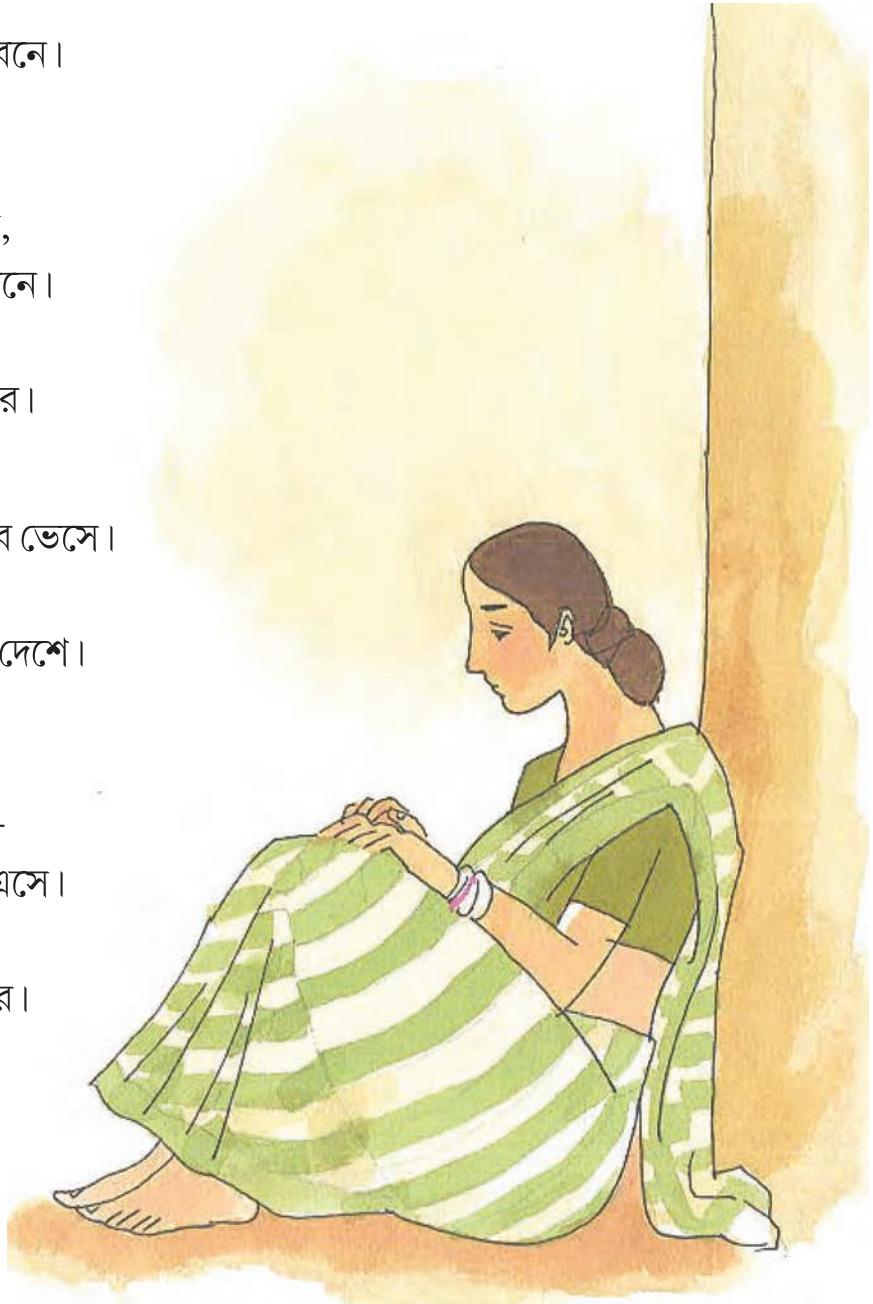
১. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

১.১ 'নৌকাযাত্রা' কবিতাটি কার লেখা?

১.২ কবিতাটি তাঁর কোন বই থেকে নেওয়া হয়েছে?

১.৩ নৌকাটি কোথায় বাঁধা আছে?

১.৪ নৌকাটিতে কী রয়েছে?

১.৫ কবিতার শিশুটি ওই নৌকা পেলে কটি পাল ও দাঁড় জুড়ে নেবে?

১.৪ পাল ও দাঁড় নৌকায় কী কী কাজে লাগে?

১.৭ হাট বলতে কী বোঝো?

১.৮ শিশুটি কার নৌকা পেতে চায়?

১.৯ সে নৌকা করে কোথায় যাবে?

১.১০ সে সঙ্গে কাকে কাকে নেবে?

১.১১ সে তার মাকে কাঁদতে বারণ করেছে কেন?

১.১২ রামকে বনবাসে যেতে হয়েছিল কেন?

১.১৩ রামচন্দ্রের কাহিনি কোন বই পড়লে জানা যায়?

১.১৪ রাজপুত্র, সোনা মানিকের কথা কোন ধরনের বইয়ে থাকে?

১.১৫ শিশুটি কী কী নিয়ে যাবে?

১.১৬ সে কখন নৌকা ছেড়ে দেবে?

১.১৭ দুপুরবেলা তার মা কোথায় থাকবেন?

১.১৮ তখন সে কোথায় থাকবে?

১.১৯ কোন কোন জায়গা পেরিয়ে শিশুটি যাবে?

১.২০ সে কখন ফিরে আসবে?

১.২১ নতুন জায়গা ঘুরে আসার গল্প তার মাকে কীভাবে শোনাবে সে ?

২. **বাক্য রচনা করো:** বাঁধা, নৌকা, সমুদ্র, গল্প, মাঝি।

৩. **বর্ণ বিশ্লেষণ করো :** রাজপুত্র, তেপান্তর, রাজগঞ্জ, দুপুরবেলা, পুকুর-ঘাট।

৪. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো:** বাঁধা, বোঝাই, মিথ্যে, সন্ধে, দেশে।

৫. **অর্থ লেখো:** দাঁড়, পাল, কোণে, মানিক, পার।

৬. **সমার্থক শব্দ লেখো:** সোনা, নৌকা, নদী, সমুদ্র, মাঠ।

৭. **এলোমেলো বর্ণগুলিকে সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :**

ত্র পু জ রা, র লা দু বে পু, টি র এ বা ক, পা তে র ন্ত, জ রা ঞ্জ গ।

৮. **শব্দযুগলের অর্থ পার্থক্য দেখাও:**

বাধা	ছ'টা	কোণে	দেশ	পার
বাঁধা	ছটা	কনে	দ্বেষ	পাড়

৯. 'পাটে' শব্দটিকে দুটি অর্থে ব্যবহার করে দুটি আলাদা বাক্য রচনা করো।

১০. **মুখে বললে কথাগুলি কীভাবে বলবে?**

১০.১ আমি কেবল যাব একটি বার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার। ....

১০.২ তখন তুমি কেঁদো না মা, যেন
বসে বসে একলা ঘরের কোণে। ....

১০.৩ ভোরের বেলা দেব নৌকা ছেড়ে,
দেখতে দেখতে কোথায় যাব ভেসে ....

১১. **ঠিক উত্তরটির নীচে দাগ দাও :**

১১.১ নৌকার মালিকের নাম (আশু/মধু/শ্যাম)।

১১.২ কবিতার শিশুটি যাবে (নৌকায়/বজরায়/জাহাজে) চড়ে।

১১.৩ তার সঙ্গে যাবে (মাঝি/বন্ধু/মা)।

১১.৪ সে যাবে (একদিনের/তিনমাসের/চোদ্দো বছরের) জন্য।

১১.৫ সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে (তেপান্তরের মাঠ/তিরপূর্ণির ঘাট/ নতুন রাজার দেশ) আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত *ভারতী* ও *বালক* পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। *কথা ও কাহিনী*, *সহজপাঠ*, *রাজর্ষি*, *ছেলেবেলা*, *শিশু*, *শিশু ভোলানাথ*, *হাস্যকৌতুক*, *ডাকঘর*, *গল্পগুচ্ছ*-সহ তাঁর বহু রচনাই শিশু- কিশোরদের আকৃষ্ট করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে 'Song Offerings'-এর জন্যে। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা। পাঠ্যাংশটি তাঁর *শিশু* নামক বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

১২. নীচের বাক্যগুলির ভাব বোঝাতে কবিতায় কীভাবে লেখা হয়েছে পাশে পাশে লেখো।

১২.১ মধু মাঝির নৌকাখানি দূরে রয়েছে। ....।

১২.২ শিশুটি হাটে ঘুরে বেড়িয়ে সময় নষ্ট করবে না। ....।

১২.৩ শিশুটির ভয়, তার মায়ের মন খারাপ হতে পারে। ....।

১২.৪ শিশুটি কিন্তু একা যাবে না। ....।

১২.৫ সেদিনই তারা সন্ধ্যার পরে ফিরে আসবে। ....।

১৩. ঘটনার ক্রমানুসারে সাজিয়ে লেখো:

১৩.১ শিশুটির মনে সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে যাওয়ার সাধ জাগে।

১৩.২ নৌকাটি পেলে সে তাতে একশোটা দাঁড় এঁটে, চারটে পাঁচটা ছটা পাল তুলে দেবে।

১৩.৩ ফিরে এসে সে তার মাকে গল্প শোনাবে।

১৩.৪ মধুমাঝির নৌকাখানি পাটে বোঝাই হয়ে রাজগঞ্জের ঘাটে বাঁধা আছে।

১৩.৫ ভোরের বেলা সে তার নৌকা ছেড়ে দেবে।

১৪. বাক্য বাড়াও:

১৪.১ মধু মাঝির নৌকা। (কেমন নৌকা?)

১৪.২ পাল তুলে দিই। (কীসে? কটা?)

১৪.৩ আমি যাব। (কোথায়? কীভাবে?)

১৪.৪ ফিরে আসতে সন্ধে হয়ে যাবে। (কোথা থেকে?)

১৪.৫ গল্প বলব। (কীসের গল্প?)

১৫. কবিতার শিশুটিকে মধু মাঝির নৌকাটি দেওয়া হলে সে কী করবে তা কবিতাটি পড়ে তোমার নিজের ভাষায় আট-দশটি বাক্যে লেখো।

১৬. বন্ধুদের সঙ্গে তোমার হয়তো কোথাও একদিনের জন্য বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে। সেকথা তুমি তোমার অভিভাবক/অভিভাবিকাকে কীভাবে জানাবে, তা পাঁচটি বাক্যে লেখো।

ঢেউয়ের তালে তালে

পিনাকীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
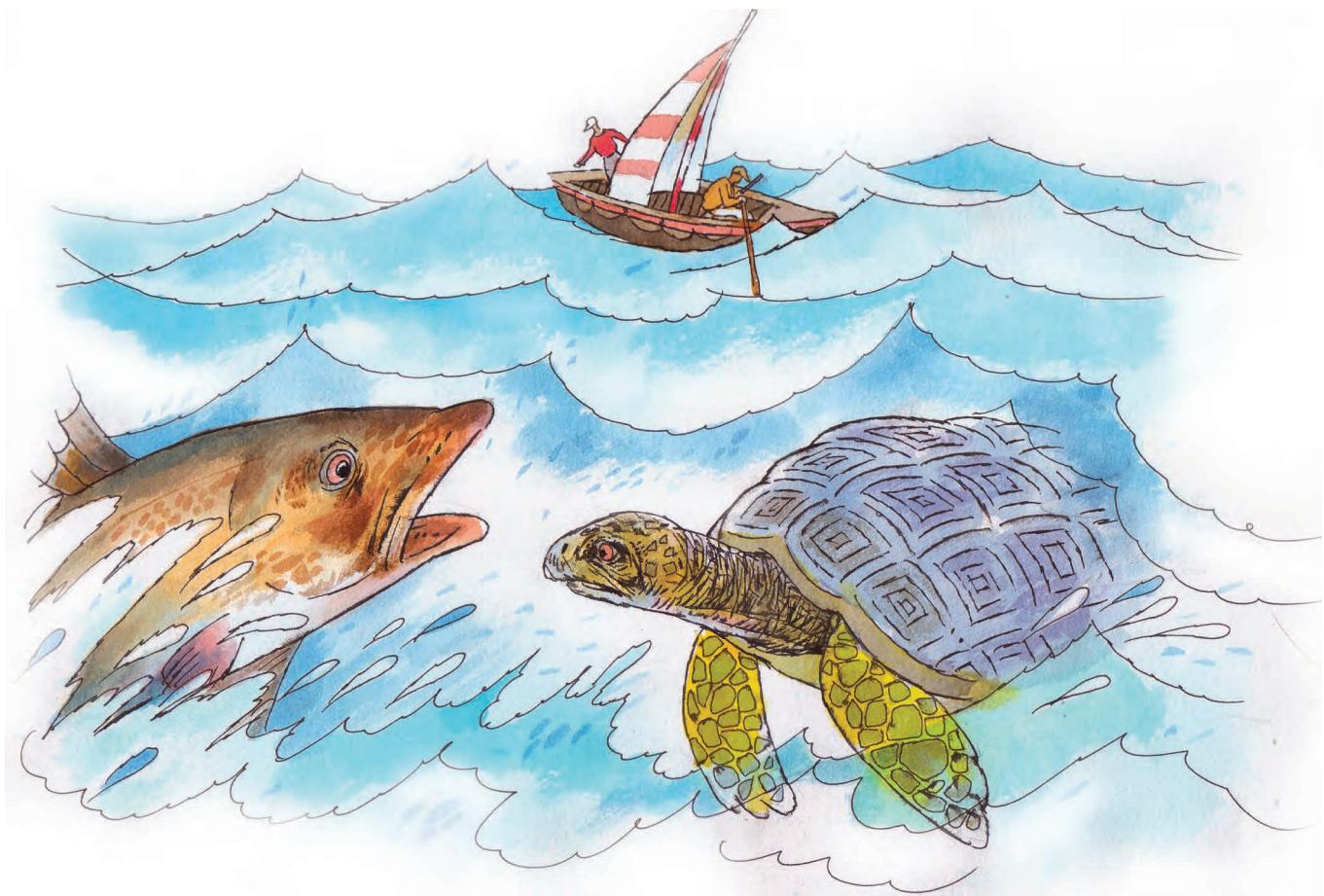
জল কেটে এগিয়ে চলছে আংরে। চারধারে পাহাড়ের মতন ঢেউ। ডিউক বলল, ‘আমরা আস্তে আস্তে ভারত মহাসাগরের দিকে এগিয়ে চলেছি।’

আজ সকাল থেকে একটা বিরাট কচ্ছপ চলেছে আমাদের পেছনে পেছনে। সমুদ্রের আর একজনের সঙ্গেও বেশ ভাব জমে উঠেছিল, কিন্তু ব্যস্ত থাকায় তাকে বিশেষ সময় দিতে পারিনি আমরা। আজ দুজনের মন খারাপ, কারণ সে আর আসছে না। সে হল আমাদের ছোট্ট পাখিটা। আবার সেক্সটান্ট নিয়ে বসেছে ডিউক। আমি প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছি জানতে, ‘না কোনো ভয় নেই আর, আমরা পার হয়ে চলেছি পথ’। এদিকে পথ ঠিক করার, আমাদের অবস্থা জানার উত্তেজনায় আমি সমুদ্রের জলে চা বানিয়েছি। বমি হয় আর কি। খটকা লাগছে অকারণেই, ডিউক ঠিক তো? ওর সেক্সটান্টে ভুল নেই তো? নাঃ, ওর কোন ভুল নেই। ভাবতে ভীষণ ভালো লাগছে এতদিন ধরে বারবার বিপর্যস্ত হবার পর আজ ঠিক পথ পেয়েছি। মনের আবেগ আর কাকে জানাব—অকারণে গলা ছেড়ে গান গাইছি, জানি না আগে পালের শুশুকগুলো তাইতেই পালাল কিনা। ডিউক বলে উঠল, ‘এসো, আজকের দিনটায় একটা কিছু করি।’ কী করা যায়। রসগোল্লা খাওয়া যাক। টিনে ভরা রসগোল্লা খেতে খেতে নৌকার দুপাশে দুজনেই হেলান দিয়ে বসে আছি। চারধারে শুধু জল আর জল। টিন শেষ হয়ে গেলে যখন ছুঁড়ে ফেলে দিলাম তখন দু-এক ফোঁটা রস গায়ে এসে পড়ল, তাড়াতাড়ি পিঁপড়ে উঠবে ভেবে সমুদ্রের জল দিয়ে ধুচ্ছি, দেখি ডিউক হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। সে মনে করিয়ে দিল পিঁপড়েকে এখানে আসতে হলে প্রায় ২০০ মাইল সাঁতরে আসতে হবে।...
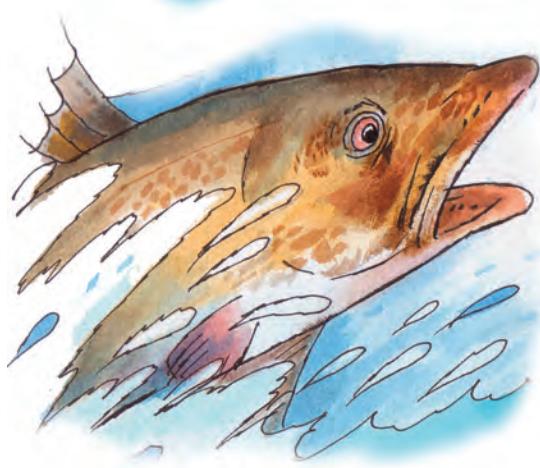
...দুপুরে পেট ভরে খেয়ে খুব দাঁড় টানা হয়েছে। এখন আংরে হু-হু করে অনুকূল স্রোতে এগিয়ে চলেছে আন্দামানের পথে। দাঁড় থামালেও স্রোতের টানে আমরা ভেসে চলেছি দক্ষিণ-পূর্ব কোণে।...

...ঘুম ভেঙেই মনে পড়ল আজ আমি রান্না করব। কথাটা ভেবেই বেশ খারাপ লাগছে। এই একটা অসহ্য ব্যাপার। আমাদের অবস্থান বার করা হলো, বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে চলেছি। এখন নৌকার যা অগোছালো অবস্থা কোথায় যে কী আছে আর মনে নেই। একটা জমানো দুধের

টিন খুঁজতেই আধ ঘণ্টা লাগল। ঢেউয়ের তালে এগোনোর পথে আর একটা কচ্ছপের সঙ্গে দেখা। ধীরে সুস্থে সাঁতরে চলেছে পিছনে পিছনে। ভয় শুধু আর একটু বন্ধুত্ব পাতাতে ও যদি জালটা মুখে করে কামড়ে ধরে...। তাহলেই কেলেঙ্কারি। হাতের কাছে একটা টর্চের ব্যাটারি ছিল। তাক করে সজোরে ছুঁড়ে মারলাম। ডিউক হো হো করে হেসে উঠল আর কচ্ছপটা আদর করলাম ভেবে এগিয়ে এল, আংরেতে ওঠে আর কি!

সত্যি আংরের চারধারে যেন এখন চিড়িয়াখানা হয়ে উঠেছে। নানা রঙের মাছেরাই এখানকার সবচেয়ে বড়ো দর্শনীয় বস্তু। আজকে ঠিক করা হলো ধরা হবে, দুপুরের দিকে কিন্তু আমরা বুদ্ধু বনে গেছি। তখনও আমি লড়ে যাচ্ছি ধরব বলে, অন্তত একটাকে। হঠাৎ আওয়াজ করে ডিউক ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে। আমার মাছ ধরা বন্ধ হলো। চারদিকে লক্ষ রাখতে বসলাম। তারপর আমিও স্নান করেছি, শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। আমরা আস্তে আস্তে অসাবধানি হয়ে উঠছি। ঠিক হলো হাঙর তাড়াবার কালি জলের চারধারে ছড়ানো হবে। ছড়ানোও হলো। দুপুরের দিকে একটু ঢুলুনি এসেছে সবে, ডিউকের ধাক্কায় ঘুম ভেঙে উঠে দেখি এক সাংঘাতিক কাণ্ড, বিরাট বড়ো একটা মাছ আর কচ্ছপের লড়াই চলেছে তখন। তাড়াতাড়ি আংরেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

হাতে কলমে

শব্দার্থ : ভাব — সখ্য। উত্তেজনা — অস্থিরতা। খটকা — খুঁতখুঁতে ভাব। অকারণে — কোনো কারণ ছাড়াই। হেলান — ঠেস। দর্শনীয় — দেখার মতো জিনিস।

অভিযান প্রসঙ্গে : ১৯৬৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি অ্যালবার্ট জর্জ ডিউক-এর সঙ্গে 'কনৌজি আংরে' নামক একটি ডিঙিনৌকায় কলকাতা থেকে আন্দামান যাত্রা করেন। ৩৩ দিন পর ৫ মার্চ তিনি সেখানে পৌঁছান। এই দুঃসাহসিক সমুদ্র যাত্রার জন্য তিনি বাঙালি তথা ভারতবাসীর কাছে চিরস্মরণীয়।

সেক্সটান্ট : যে যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রের কৌণিক উচ্চতা মাপা হয়, তার নাম সেক্সটান্ট। অভিযাত্রীদের কাছে দিকনির্ণয়ের জন্য এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র।

১. **এক কথায় উত্তর দাও :**

১.১ অভিযানে লেখকের সঙ্গীর নাম কী ?

১.২ অভিযানের নৌকোটির নাম কী ?

১.৩ নৌকোটি কোন মহাসাগরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ?

১.৪ লেখকের অভিযানের গন্তব্যস্থল কোথায় ছিল ?

১.৫ ডিউক হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছিল কেন ?

১.৬ দুপুরবেলা মাছের সঙ্গে কার লড়াই চলছিল ?

১.৭ আংরের চারধারে যে চিড়িয়াখানা তৈরি হয়েছিল তাতে কারা ছিল সবচেয়ে দর্শনীয় বস্তু ?

পিনাকীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৬-১৯৮৩) : প্রখ্যাত সাঁতারু। দুঃসাহসিক নৌ-অভিযাত্রী। কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের ফিজিওলজির অধ্যাপক ছিলেন। 'এক্সপ্লোরার্স ক্লাব'-এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। নিপুণ ক্রীড়াবিদ। পরপর দুবছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্লু'। 'ঢেউয়ের তালে তালে' পাঠ্যাংশটি তাঁর 'আন্দামান অভিযান' বই থেকে নেওয়া।

২. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

২.১ জল কেটে এগিয়ে চলছে ________ ।

২.২ আজ সকাল থেকে একটা ________ চলেছে আমাদের পেছনে পেছনে।

২.৩ আবার ________ নিয়ে বসেছে ডিউক।

২.৪ ________ খাওয়া যাক।

২.৫ পিঁপড়েকে এখানে আসতে হলে প্রায় ________ মাইল সাঁতরে আসতে হবে।

২.৬ হঠাৎ আওয়াজ করে ________ ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে।

৩. **টীকা লেখো :**

সেক্সটান্ট, কনৌজি আংরে, চিড়িয়াখানা, রসগোল্লা, অভিযান।

৪. **বাক্য তৈরি করো :**

সমুদ্র, কচ্ছপ, নৌকো, পিঁপড়ে, সাঁতার, ঘুড়ি।

৫. **বিপরীতার্থক শব্দটি লেখো :**

বিরাট, পেছনে, বন্ধ, ঠিক, দিন।

৬. **নির্দেশ অনুসারে উত্তর দাও :**

৬.১ মনে করো, নৌকো চেপে তুমি কোথাও বেড়াতে গেছ — যাওয়ার সময় যা যা দেখতে পাবে, তা লেখো।

৬.২ ভারতবর্ষের মানচিত্রে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, কলকাতা, বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগর —এদের অবস্থান শিক্ষিকা / শিক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকে দেখে জেনে নাও।

৬.৩ অভিযান কাকে বলে ? শিক্ষিকা / শিক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকে যে কোনো একটি পর্বতশৃঙ্গে অভিযান বা একটি মহাকাশ অভিযানের গল্প জেনে নিয়ে, সে সম্পর্কে চার-পাঁচটি বাক্য লেখো।

৬.৪ পাঁচটি সামুদ্রিক প্রাণীর নাম লেখো।

___

___

___

পর্যটন

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মাথায় মস্ত পাগড়ি এঁটে,
গজিয়ে দাড়ি, গুম্ফ ছেঁটে
কেষ্টবাবু, কোথায় যান?

বাদকশান্, বাদকশান্!

কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে
সিংহসম লম্ফ দিয়ে
বিষ্টুবাবু, যান কোথায়?

মোম্বাসায়, মোম্বাসায়!

উড়িয়ে ধুলো মহেশ দাস
ভরদুপুরে কোথায় যাস?
হঠাৎ কোথায় চললি রে?

সান্টা ফে, সান্টা ফে!

সবাই এখন ছাড়ছে ঘর,
কেষ্ট বিষ্টু মহেশ্বর।
ব্যাপার দেখে হচ্ছে শখ

আমিও হব পর্যটক!

কিন্তু আমি কোথায় যাই,
একটি বিনে টঙ্কা নাই।
তাই নিয়ে যাই কোথায় আর?

শ্যামবাজার, শ্যামবাজার।

হাতে কলমে

বাদকশান্ : উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তান ও দক্ষিণ-পূর্ব তাজাকিস্তানের অংশ জুড়ে অবস্থিত। সংগীতের জন্য বিখ্যাত। তাজিক, উজবেক ও কিরঘিজ জাতির মানুষেরা এখানে থাকেন।
মোম্বাসা : ভারত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত আফ্রিকা মহাদেশের কেনিয়া দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর-শহর। এখানে বেড়ানোর জন্য বিভিন্ন দেশের পর্যটকেরা আসেন।
সান্টা ফে : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো প্রদেশের রাজধানী শহর। স্প্যানিশ ভাষায় সান্টা ফে নামটির অর্থ 'পবিত্র বিশ্বাস'। এটি পর্যটকদের অন্যতম পছন্দের জায়গা।
শ্যামবাজার : উত্তর কলকাতার একটি প্রাণচঞ্চল আর বনেদি পাড়া। আগে এই অঞ্চলটির নাম ছিল সুতানুটি।

১. এককথায় উত্তর দাও :

১.১ পর্যটন করেন যিনি তাঁকে কী বলা হয়?
১.২ 'ভ্রমণ' শব্দটির অর্থ লেখো।
১.৩ বাদাকশান্, মোম্বাসা, সান্টা ফে, শ্যামবাজার— এই জায়গাগুলো কোথায়?
১.৪ কেষ্ট, বিষ্টু, মহেশ্বর নামগুলো কবিতাটিতে কী অর্থে ব্যবহার হয়েছে?
১.৫ কবিতায় লোকটির মনে বেড়ানোর 'শখ' জাগল কেন?
১.৬ যাঁরা পর্যটনে বেরিয়েছেন, তাঁদের হাবভাব, সাজপোশাক, চলাফেরা কীভাবে কবিতাটিতে ধরা পড়েছে?
১.৭ সাধারণত মানুষজন কখন বেড়াতে বেরোন?
১.৮ মানুষের বেড়ানোর ইচ্ছে হয় কেন?

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (জন্ম ১৯২৪) : প্রখ্যাত কবি ও সম্পাদক। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার বই 'অন্ধকার বারান্দা', 'নক্ষত্রজয়ের জন্য', 'কলকাতার যীশু', 'উলঙ্গ রাজা' প্রভৃতি। 'কবিতার ক্লাস' নামক কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধের বই লিখেছেন। প্রধানত প্রকৃতি ও সমকালীন জীবনের ছোটো ছোটো ঘটনা নিয়েই তাঁর কবিতার জগৎ। ২০১৬ সালে পেয়েছেন 'রবীন্দ্র পুরস্কার'।

প্রচলিত গল্প

গাছেরা কেন চলাফেরা করে না

অনেক অনেক বছর আগেকার কথা।
একসময় পৃথিবীতে গাছেরাও চলাফেরা করতে পারত। শেকড়বাকড় মাটির নীচে চালাচালি করে দিব্যি তারা ঘুরে বেড়াত।

তখন পৃথিবী ছিল অনেক সবুজ, অনেক সুন্দর। সে সময় গাছ ও মানুষ ছিল দুজনের বন্ধু। তারা একে অপরের উপকারী সাথি বলেই মনে করত।

কোনো যানবাহন ছিল না। মানুষকে হেঁটে হেঁটেই দূর-দূরান্তরে যেতে হতো। হাত-বাক্সো নিয়ে যাওয়া ছিল এক কঠিন ব্যাপার। গাছেরাই তখন সে-দায়িত্ব পালন করত। তাদের শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে দিত চারদিকে। মানুষ তাদের পোশাক-আশাক বাক্সো-প্যাঁটরা, থলি সেখানে ঝুলিয়ে রাখত।

এমনকি মানুষ চাইলে তার জিনিস তার গ্রামে পৌঁছে দেবার কাজও করত এই সব উপকারী গাছেরা। ঠিকমতো গাছেদের ডালে জিনিস রেখে তাদের নির্দেশ দিলেই গাছ হেঁটে গিয়ে সেই জিনিসপত্র ঠিক ঠিক লোকের বাড়িতে পৌঁছে দিত।

এমনকি বুড়ো লোকের উপকারেও আসত গাছেরা। তার জন্য বুড়ো লোককে গাছের ডালে চড়তে হতো। তারপর গাছেরাই তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিত। এমনকি সে যেখানে যেতে চায় সেখানেও তাকে পৌঁছে দিত। কী সুন্দর ছিল সে সব দিন!

এমন আশ্চর্য ভ্রমণ কে আর কবে দেখেছে? তোমরাও দেখোনি।

একবার একদল লোক জঙ্গলে গিয়েছিল। ফিরে আসার পর প্রত্যেকেই ভীষণ ক্লান্ত। চলবার শক্তিটুকু আর নেই। তখনই ঠিক করল কাঁধে রাখা বোঝার ওজন কমাতে গাছের ডালে জিনিসপত্র রেখে দেবে। সেই মতো তাদের ভারী জিনিসপত্র তারা গাছের বিভিন্ন ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে নিজেরা হেঁটে চলল। কিন্তু এত ওজন গাছের ডাল সহ্য করতে পারল না। ডালগুলি সব কাত হয়ে ঝুঁকে পড়ল নীচে। মানুষেরা তা দেখে সহানুভূতি দূরে থাক, হো হো করে হেসে উঠল। এর আগে তারা কোনোদিন গাছকে এমন অসহায় অবস্থায় দেখেনি। করুণার বদলে তাদের মুখে কুৎসিত হাসি ফুটে উঠল। এমনকি সকলে মিলে আনন্দে হাততালি দিল। এমন উপহাস গাছেদের সহ্য হলো না। তারা অপমানিত বোধ করল। তখনই ঠিক করল, অনেক হয়েছে, আর তারা চলাফেরা করবে না।

তারপর থেকে ভ্রমণের সময় মানুষের জিনিসপত্র ভারী হলেও মানুষকেই বইতে হয়। গাছ আর চলাফেরা করে না বলেই মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা করে না। তবু গাছেরা আজও কত উপকারী। ফুল, ফল মানুষকে উপহার দেয়। মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য অক্সিজেন জোগান দেয় নিয়মিত। মানুষকে রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচায়। নদীর পাড়ে ভাঙন থেকে মানুষকে বাঁচায়। গাছগাছালি দিয়ে কত ওষুধ তৈরি হয়। কত পাখি গাছে বাসা বাঁধে।

গাছেদের দুঃখ একটাই, তারা এখন আর চলাফেরা করে না। কেন চলাফেরা করে না, আশা করি, তা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।
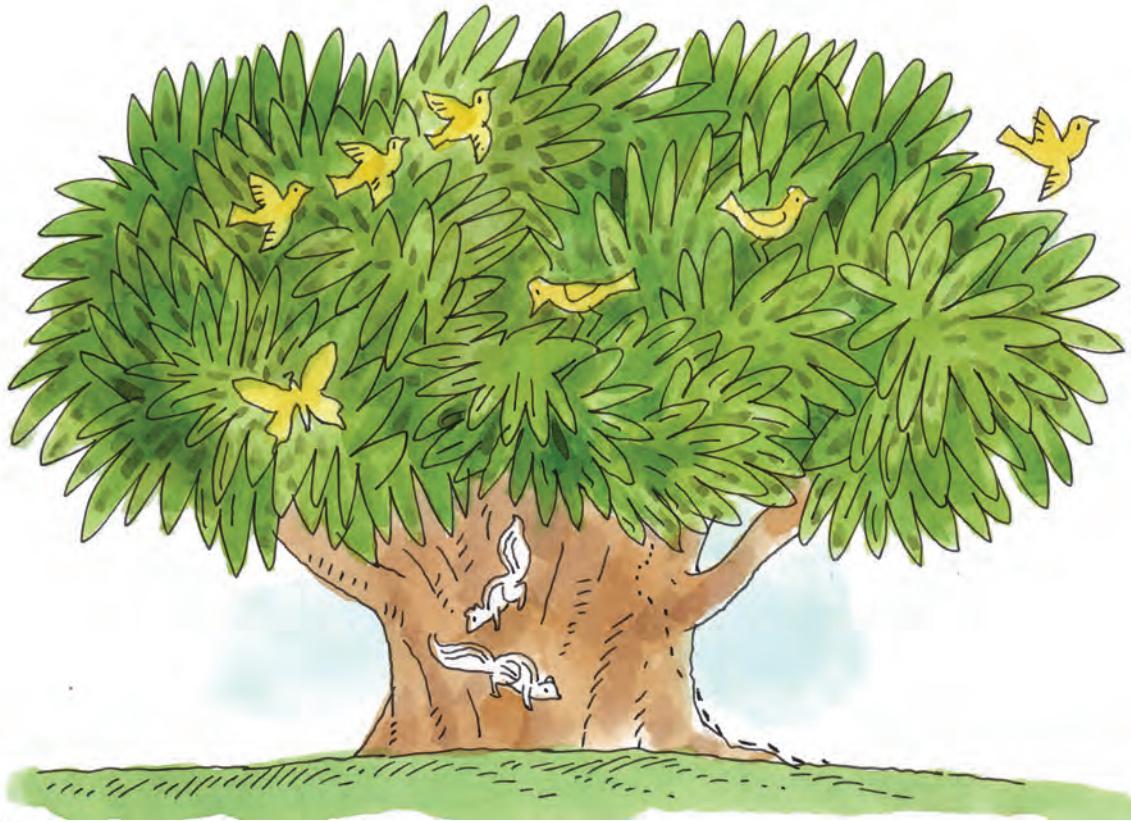
১. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১.১ কোন সময়ের কথা গল্পটিতে বলা হয়েছে?
১.২ একসময়ে গাছেরা কীভাবে চলাফেরা করত?
১.৩ তখন পৃথিবী কেমন ছিল?
১.৪ মানুষ আর গাছের সম্পর্ক তখন কেমন ছিল?
১.৫ মানুষ কীভাবে তখন যাতায়াত করত?
১.৬ গাছেরা তখন কোন দায়িত্ব পালন করত?
১.৭ মানুষ গাছের শাখাপ্রশাখায় কী কী ঝুলিয়ে রাখত?
১.৮ গাছেরা কীভাবে বুড়ো লোকেদের উপকারে আসত?
১.৯ জঙ্গল থেকে ফেরার পথে একদল লোক কী করল?
১.১০ ডালগুলো কাত হয়ে নীচে ঝুঁকে পড়ল কেন?
১.১১ ডালগুলো ঝুঁকে পড়তে দেখে মানুষেরা কী করল?
১.১২ গাছেরা অপমানিত বোধ করল কেন?
১.১৩ তখন তারা কী ঠিক করল?
১.১৪ তারপর থেকে কী হয়?
১.১৫ গাছেরা আজও মানুষের কী কী উপকার করে?

শব্দার্থ : পৃথিবী—দুনিয়া, জগৎ। চলাফেরা—হাঁটা-চলা, যাতায়াত। শেকড়বাকড়—গাছের মূল। উপকারী—যে উপকার করে, যে ভালো করে। সাথি— সঙ্গী, বন্ধু। দূর-দূরান্তরে—অনেক দূরে। পালন করা—মেনে চলা। শাখাপ্রশাখা—ডালপালা। পোশাক-আশাক—কাপড়-চোপড়। বাক্সো-প্যাঁটরা—নানারকম বাক্সো। থলি—থলে, ঝোলা। নিরাপদ—যেখানে বিপদ-আপদ নেই। স্থান—জায়গা। আশ্চর্য—আজব, অবাক করার মতো। ভ্রমণ— ঘুরে বেড়ানো। ক্লান্ত—শ্রান্ত, অবসন্ন। করুণা—দয়া-মায়া। কুৎসিত—বিশ্রী, কদর্য। হাততালি—করতালি, হাতে হাতে মেরে আনন্দসূচক আওয়াজ। অপমানিত---যাকে অপমান করা হয়েছে, অসম্মানিত। সহযোগিতা—সাহায্য। শ্বাসপ্রশ্বাস—শ্বাস নেওয়া আর ছাড়া। অক্সিজেন—শ্বাসবায়ু। পাড়—নদীর তীর। গাছগাছালি—নানারকম গাছ।

২. **বন্ধনীর থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :**

২.১ (শেকড় বাকড় / শাখাপ্রশাখা) মাটির নীচে চালাচালি করে দিব্যি তারা ঘুরে বেড়াত।

২.২ মানুষকে (ট্রেনে বাসে / হেঁটে হেঁটেই) দূর-দূরান্তরে যেতে হতো।

২.৩ একবার একদল লোক (জঙ্গলে / বন্দরে) গিয়েছিল।

২.৪ সকলে মিলে (দুঃখে / আনন্দে) হাততালি দিল।

৩. **বাক্য বাড়াও :**

৩.১ মানুষকে হেঁটে হেঁটেই যেতে হতো। (কোথায়?)

৩.২ মানুষ গাছের শাখাপ্রশাখায় ঝুলিয়ে রাখত। (কী?)

৩.৩ ফিরে আসার পর সকলেই ক্লান্ত। (কেমন?)

৩.৪ ডালগুলি সব কাত হয়ে ঝুঁকে পড়ল নীচে। (কেন?)

৩.৫ মানুষের জিনিসপত্র ভারী হলেও মানুষকেই বইতে হয়। (কখন?)

৪. **নীচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা করো :**

গাছগাছালি, সহযোগিতা, অক্সিজেন, বাক্সো-প্যাঁটরা, ভ্রমণ।

৫. **শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসাও :**

৫.১ একসময়ে পৃথিবীতে গাছেরাও চলাফেরা _______। (করতাম/করতে/করত)

৫.২ কোনো যানবাহন _______। (ছিল না/ছিলে না/ছিলাম না)

৫.৩ তোমরাও _______। (দেখিনি/দেখেনি/দেখোনি)

৫.৪ তারা অপমানিত বোধ _______। (করলে/করল/করলাম)

৫.৫ কত পাখি গাছে বাসা _______। (বাঁধে/বাঁধো/বাঁধি)

৬. **এলোমেলো বর্ণগুলিকে সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো:**

লি ডা ল গু, খা প্র শা শা খা, রী প উ কা, স জি প নি ত্র, লা রা ফে চ।

৭. **বর্ণ বিশ্লেষণ করো :**

নির্দেশ, ভাঙন, ভীষণ, দেখেনি, আনন্দ।

৮. নীচের ছবি অনুযায়ী পরে লেখা কথাগুলি মিলিয়ে লেখো :

৮.১ ______________________

৮.২ ______________________

৮.৩ ______________________
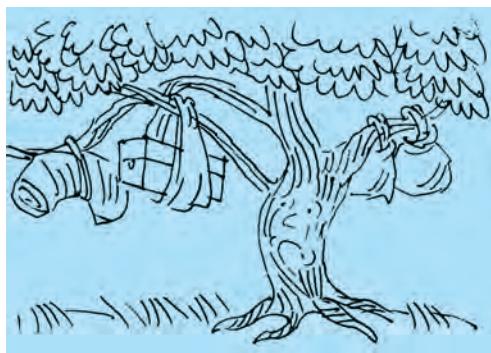
৮.৪ ______________________
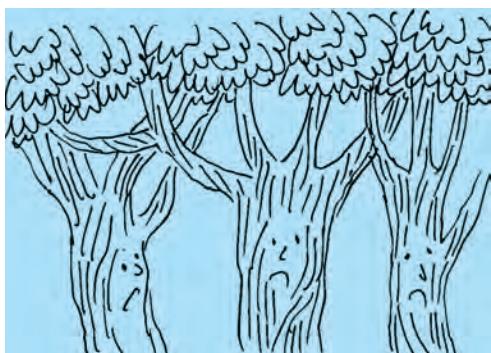
৮.৫ ______________________

৮.৬ ______________________

- মানুষ তাদের পোশাক-আশাক, বাক্সো-প্যাঁটরা, থলি গাছের শাখা প্রশাখায় ঝোলাত।
- এমন উপহাস গাছেদের সহ্য হলো না। তারা অপমানিত বোধ করল।
- তারপর থেকে ভ্রমণের সময় মানুষের জিনিসপত্র ভারী হলেও মানুষকেই বইতে হয়।
- এত ওজন গাছের ডাল সহ্য করতে পারল না, ডালগুলি কাত হয়ে ঝুলে পড়ল নীচে।
- মানুষকে হেঁটে হেঁটেই দূর-দূরান্তরে যেতে হতো। কোনো যানবাহন ছিল না।
- একসময়ে পৃথিবীতে গাছেরাও চলাফেরা করতে পারত।

অঙ্কন : সুব্রত মাজী

৯. সূত্রগুলি ব্যবহার করে নীচের খেলাটি খেলো :

		১০. গা		গা		লি			
							৯. ভ্র		ণ
					৮. উ			স	
৭.	ক্	সি							
					৬. স			ভূ	
			৫.	খা			খা		
	৪.		সো	প্যাঁ					
					৩.	ন			ন
						২.	প	কা	
১.		ড়			ড়				
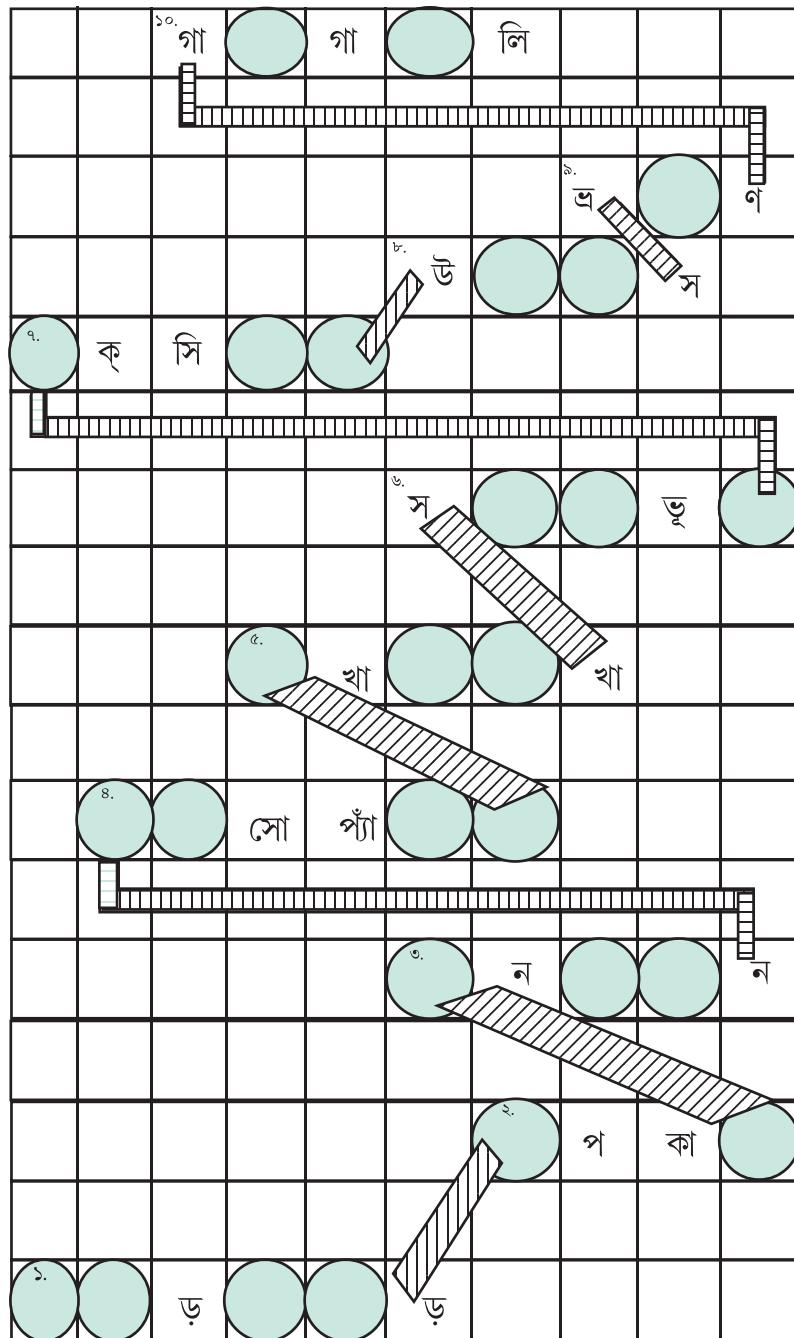
সূত্র :

১. গাছের মূল

২. উপকার করে যে

৩. যা চড়ে আমরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাই

৪. নানারকম বাক্সো

৫. ডালপালা

৬. সমবেদনা

৭. শ্বাসবায়ু

৮. তামাশা

৯. বেড়াতে যাওয়া

১০. নানারকম গাছ

সমাধান :

১.শেকড় বাকড় ২.উপকারী ৩.যানবাহন ৪.বাক্সো প্যাঁটরা ৫.শাখাপ্রশাখা ৬.সহানুভূতি ৭.অক্সিজেন ৮.উপহাস ৯. ভ্রমণ ১০.গাছগাছালি

একই লেখকের পরপর দুটি লেখা। একটি কবিতা, একটি গল্প। গাছ লাগানোর উপকারিতা আর গাছ কাটার বিপদ সম্বন্ধে এই দুটি লেখা থেকে তোমরা জানবে।

গাছ বসাব

কার্তিক ঘোষ

এইখানে জল
ওইখানে জল
কোথায় তখন ডাঙা......
মাথার ওপর
সুয্যি যেন
বাপরে আগুন রাঙা!
ওই যদি মেঘ
এই তবে ঝড়
নিত্য জলের ধারা,
তার মধ্যেই
হঠাৎ কখন
পড়ল প্রাণের সাড়া!
সবুজ সবুজ
শ্যাওলা প্রথম
জন্ম নিল জলে...
তারপরে এই
গাছ এল সব—
রূপকথা কে বলে?
পড়তে পড়তে
গাছের কথা
গর্ব হবে কারও—
কেউ বলবে,
একশোটা নয়
গাছ বসাব আরও।।

জুঁইফুলের রুমাল

কার্তিক ঘোষ

গাছেরা যেমন। পাখিরাও তেমন।

লিপিকে একটু দেখতে পেলেই হলো। খুশিতে একেবারে ডগমগ।

গাছেরা কথা বলতে না পারুক, পাতায় পাতায় হাততালি দিয়ে, ডাল দুলিয়ে, ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে এমন করবে যে বলার নয়! আর পাখিরা?

শালিক, ছাতারে, টিয়া, চন্দনা, বেনেবউ, বাবুই, টুনটুনি—এমনকি জামরুল গাছের কাঠবেড়ালিরাও কিচিমিচি, টুকুক-টুকুক—টুই টুই টুইচ টুইচ করে এমন হইচই করে যে টুসিদের পুষি বেড়ালটাও হাঁ হয়ে বসে থাকে বারান্দায়।

আসলে, এগরায় যেখানটায় লিপিদের বাড়ি, ঠিক তার কাছেই মল্লিকবাবুদের কবেকার একটা বাগান। শাল, সেগুন, আকাশমণি, আম, জাম, জামরুল আর কদম, চাঁপা, কৃষ্ণচূড়া, বকুলগাছে থইথই।

সেখানের বড়োগাছ, মেজোগাছ, সেজোগাছ, আর ছোটোগাছেদের বউ, ছেলেমেয়ে, নাতিপুতি মানে ছোটো ছোটো গাছের চারা—তারাও জানে লিপি ওদের বন্ধু।

ইস্কুলের ছুটি হলেই লিপি চলে যায় বাগানে।

কোনোদিন সঙ্গে থাকে টুসি, না হয় দোলন। কোনোদিন সুধাদিদিও আসে। আসে বিট্টু। লিপি কাউকে দেয় কৃষ্ণচূড়ার চারা। কাউকে দেয় বকুল বিচি। কখনো কাঁচামিঠে গাছটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে।

বাগানের গাছেরাও দেখে, পাখিরাও জানে—ছোটো ছোটো চারাগাছেদের একটুও কষ্ট নেই লিপির জন্যে। বড়ো গাছেরাও খুশি। গোটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে ওদের নাতিপুতিরা। যেখানে ভালো জল, হাওয়া, আলো—সেখানেই হঠাৎ খুশিতে হিলহিলে হয়ে ওঠে একটা চারাগাছ।

কারও উঠোনে, পুকুরের ধারে, রাস্তার পাশে লুকিয়ে লুকিয়ে গাছ বসিয়ে আসে লিপি।

মা কত করে ডাকে। না, ঘরের কাজে একদম মন বসে না লিপির। বাবাও কাজ করে চাষের জমিতে। গাছের চারা যেন ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে। বাবার কাছে তাদের আদর দেখে একটুও হিংসে হয় না ওর।

কিন্তু মাঝিপাড়ার তিনটে ছাগল বড্ড বিদঘুটে। গাছের চারা দেখলেই মুড়িয়ে দেবে কুচমুচ করে।

তবে বাগানের খরগোশ দুটো খুব ভালো।

দূর থেকে পুটপুট করে লিপিকে দেখে। এমন ভীতু, ডাকলেও কাছে আসবে না কিছুতে। ওরা কেউ চারাগাছে মুখ দেয় না। ঘাস খায় ঘুরে ঘুরে। আর বিট্টুকে দেখলেই এমন ছুটবে যে বলার নয়।

ইস্কুলের জানলা দিয়েও বাগানটা বেশ দেখা যায়।

ড্রয়িং খাতায় কত রকম গাছের কত সব ছবি এঁকেছে লিপি। পাতায়-ফুলে কত রকম রং। গাছেদেরও চোখ জুড়িয়ে যায় দেখে!

কিন্তু কদমগাছের টিয়া আর জামরুল গাছের কাঠবেড়ালি-বউ কথাটা প্রথম শুনে এল শানুদের বাড়ি থেকে। ওদের কামরাঙা গাছটায় সেদিন নেমন্তন্ন ছিল কিনা!

শানুর বাবাই বলছিল কথাটা।

মল্লিকবাবুদের বাগানে এবার নাকি বাড়ি উঠবে আকাশ-ছোঁয়া। গাছপালা, পুকুরটুকুর কিচ্ছু আর থাকবে না। সব শহর হয়ে যাবে!

শুনেই তো মনটা খারাপ হয়ে গেল ওদের।

পরের দিন ঘাস খেতে বেরিয়ে খরগোশ দুটোও দেখল, অচেনা কটা লোক, গাছেদের গায়ে কী যেন সব লিখছে চকখড়ি দিয়ে!

ওমা! এসব কী কাণ্ড!

শহুরে মানুষ দেখেই চেঁচিয়েমেচিয়ে উঠল সব পাখিরা।

টিয়া সবাইকে ডেকে বলল, শোনো—

কাঠবেড়ালি-বউ আসল কথাটা বলতে গিয়ে কেঁদেই ফেলল চিকচিক করে।

তারপর—এদিক থেকে খবরটা ওদিকেও ছড়িয়ে পড়ল হঠাৎ।

লিপি বাবাকেও কিছু বলল না। মাকেও না। শুধু সুধাদিদি, টুসি, লুসি আর টুপাইকে কী যেন বলে এল কানে কানে।

বিট্টু ওদের পিকুদিদি, দোলন, বাচ্চুদাদা, পল্টন, টাবলু, গাবলু, ছোটন আর পম্পি সব্বাইকে বলে রাখল খবরটা।

গাছেরাও জানত না। পাখিরাও না।

শহর থেকে কাঠুরেরা কবে আসবে শুধু জানত মল্লিকবাবুদের বাড়ি।

কিন্তু লিপিরা, টুসিরা আর বিট্টুরা কেমন করে জানল?

একটা করে গাছকে জড়িয়ে ধরে সেদিন কিনা দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই!

কাঠুরেরা বলল, সরো। আমরা গাছ কাটব।

ওরা কেউ কথা বলল না।

মল্লিকবাবুর বড়ো ছেলে খবর পাঠাল পুলিশে। বড়ো দারোগা নিজেই এলেন সব শুনে। বাগান জুড়ে ছোটোদের দেখে তিনি তো হেসেই ফেললেন হোঃ হোঃ করে!

বললেন, না-না। আমি তোমাদের ধরতে আসিনি।

তাহলে?

বড়ো দারোগা একটা সেপাইকে ডেকে বললেন, যাও, এদের সবার জন্যে চকলেট নিয়ে এসো দুটো করে।

কাঠুরেরাও হাঁ হয়ে গেল তখন!

—শোনো, বড়ো দারোগা লিপির দু-কাঁধে হাত রেখে বললেন, কেউ তোমাদের একটাও গাছ কাটতে পারবে না এখান থেকে। বুঝলে? আমার হুকুম।

কথাটা শুনেই আনন্দে চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে গেল লিপির।

গাছের ডালে ডালে বসেছিল পাখিরা।

টিয়া বলল, আমরা ওদের কিছু দেব না?

বাবুইগিন্নি মুচকি একটু হেসে বলল, দেব বইকি! এই সময় তো জুঁই ফুলের মেলা। যাও—তোমরা যে যা পারো তুলে নিয়ে এসো আমার কাছে।

বেনেবউ বলে, কী করবে অত ফুল দিয়ে?

বাবুইগিন্নি মুখের ভাবখানা বড়ো দারোগার মতো করে বলল, ওদের জন্যে রুমাল বুনব একটা করে। ছোটো ছোটো রুমাল।

১. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১.১ লিপিকে দেখলে কারা খুশি হয়?

১.২ খুশি হয়ে তারা কী করে?

১.৩ লিপিদের বাড়ি কোথায়?

১.৪ বাড়ির পাশের বাগানটা কাদের?

১.৫ লিপি কখন বাগানে যায়?

১.৬ তার সঙ্গে কে কে থাকে?

১.৭ চারাগাছ কোথায় খুশিতে হিলহিলিয়ে ওঠে?

১.৮ লিপি কোথায় কোথায় লুকিয়ে লুকিয়ে গাছ বসায়?

১.৯ মাঝিপাড়ার ছাগল তিনটে বিদঘুটে কেন?

১.১০ বাগানের খরগোশ দুটো কেমন?

১.১১ ড্রয়িং খাতায় লিপি কী-সব ছবি এঁকেছে?

১.১২ কাঠবেড়ালি বউ কোথা থেকে, কী শুনেছিল?

১.১৩ শানুর বাবা কী বলেছিলেন?

১.১৪ কাদের দেখে পাখিরা চেঁচিয়েমেচিয়ে উঠল?

১.১৫ লিপি কাদের কানে কানে কথা বলেছিল?

১.১৬ কাঠুরেরা এলে লিপিরা কী করল?

১.১৭ কে পুলিশে খবর দিল?

১.১৮ কে লিপিদের উপহার দিতে চাইল?

১.১৯ বাবুইগিন্নি কী উপহার দিয়েছিল?

১.২০ জুঁই ফুল কোন ঋতুতে ফোটে?

কার্তিক ঘোষ (জন্ম ১৯৫০) : বিখ্যাত কবি ও ছড়াকার। ইস্কুল জীবন থেকে লেখালেখি শুরু। উল্লেখযোগ্য বই ‘একটা মেয়ে একা’, ‘হাত ঝুমঝুম পা ঝুমঝুম’, ‘আমার বন্ধু গাছ’, ‘দলমা পাহাড়ের দুলকি’ ‘এ কলকাতা সে কলকাতা’, ‘জুঁইফুলের রুমাল’ প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ ‘শ্রেষ্ঠ কিশোর কল্পবিজ্ঞান’, ‘সেরা রূপকথার গল্প’, ‘সেরা কিশোর অ্যাডভেঞ্চার’ প্রভৃতি। ১৯৭৬-এ ‘টুম্পুর জন্য ’ লেখাটির জন্য সংসদ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। ১৯৯৩-এ পান ‘শিশু সাহিত্য জাতীয় পুরস্কার’। এছাড়াও পেয়েছেন ‘তেপান্তর’ ও ‘সুনির্মল স্মৃতি পুরস্কার’।

শব্দার্থ : ডগমগ—মাতোয়ারা, আত্মহারা। কাঁচামিঠে—কাঁচা হলেও মিঠে। বিদঘুটে—বদখত, ছন্নছাড়া। মুড়িয়ে দেওয়া—মুন্ডন করা, ন্যাড়া করে দেওয়া। ড্রয়িং খাতা—ছবি আঁকার খাতা। নেমন্তন্ন—নিয়ন্ত্রণ, দাওয়াত। বড়ো দারোগা— কোনো থানার পুলিশ প্রধান। ঝাপসা—অস্পষ্ট। মুচকি—মৃদু। গিন্নি—গৃহিণী, বউ।

১. নীচের শব্দঝুড়ি থেকে শব্দ নিয়ে ঠিক স্তম্ভে বসাও :

গাছ	পাখি

শাল, শালিক, বাবুই, কদম, ছাতারে, বেনেবউ, আকাশমণি, টিয়া, কৃষ্ণচূড়া, জামরুল, চন্দনা, সেগুন, জাম, টুনটুনি, বকুল, চাঁপা, কামরাঙা, আম

এগরা : পূর্ব মেদিনীপুরের একটি জায়গা। কাঁথির উত্তরে অবস্থিত এই জায়গাটি এখন একটি শহর হয়ে উঠেছে।

বাবুইপাখি: ছোটো এক ধরনের পাখি। ঠোঁট দিয়ে খড়-কুটো-পাতা চমৎকার সেলাই করে বাসা বানায়। এইজন্য এদের 'দরজিপাখি' বলা হয়। বাবুইগিন্নি লিপি ও তার বন্ধুদের জুঁইফুল সেলাই করে ছোটো ছোটো রুমাল বানিয়ে দিয়েছিল।

চিপকো আন্দোলন : লিপি আর তার বন্ধুরা যেভাবে গাছেদের জড়িয়ে ধরে গাছ কাটা আটকে দিয়েছিল, এমন ঘটনা কিন্তু সত্যি সত্যিই আগে ঘটেছে। আমাদের দেশেই। ১৭৩১ সালে রাজস্থানের যোধপুরের কাছে খেজারলি গ্রামে বিশনোই সম্প্রদায়ের ৩৬৫ জন মানুষ প্রথম অমৃতা দেবীর নেতৃত্বে ঠিক এইভাবে গাছ কাটায় বাধা দেন। ১৯৭৪ সালে উত্তরাখণ্ড রাজ্যের গাড়োয়াল হিমালয়ের চামোলি জেলায় হেমওয়ালঘাটির রেনি গ্রামের মানুষ বন দফতরের নির্দেশ না মেনে গাছেদের জড়িয়ে ধরেন। হিন্দিতে 'চিপকো' শব্দের মানে 'জড়িয়ে ধরো'। গাছ বাঁচানোর এই আন্দোলন ক্রমে খুব জনপ্রিয় হয় এবং গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। যে মানুষরা অরণ্যে বা অরণ্যের কাছাকাছি থাকেন, তাঁরাই সে দেশের অরণ্যকে রক্ষা করেন। অরণ্যের ওপর তাঁদের অধিকারও এইসময় থেকে আইন অনুসারে স্বীকৃত হয়।

২. গাছ কাটার ব্যাপারে লিপি আর বিট্টু তাদের বন্ধুদের আগেই কানে কানে কিছু কথা বলে এসেছিল। কে কাকে বলেছিল মনে রেখে নির্দিষ্ট খোপে তাদের নাম বসাও।
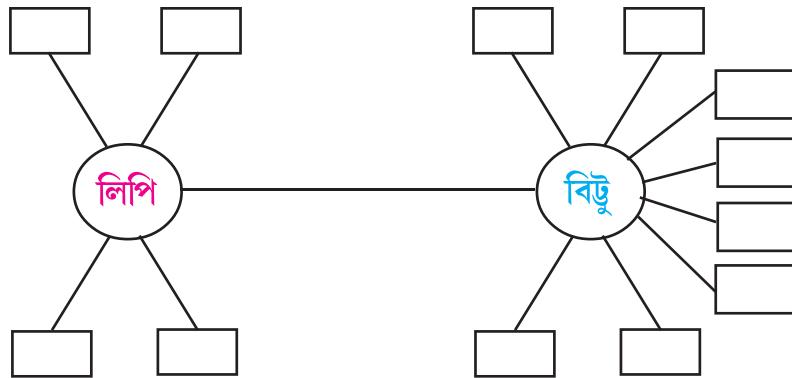
৩. এই গল্পে মোট চারটি পশুর নাম আছে। কাঠবেড়ালি, ছাগল, খরগোশ আর পুষি বেড়াল। এদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে একটি করে বাক্য লেখো।

৪. এই গল্পে যে সব গাছ আর পাখির নাম আছে, তাদের নিয়েও একটি করে বাক্য লেখো। এছাড়াও তোমার জানা আরও কিছু গাছ আর পাখির নাম লেখো।

৫. এই গল্প পড়ে লিপিকে তোমার কেমন লেগেছে? যদি ভালো লাগে তবে কেন ভালো লেগেছে বুঝিয়ে বলো।

৬. বড়ো দারোগাবাবু লোকটা কেমন?

৭. নীচে এমন কয়েকজনের নাম দেওয়া হলো যারা গাছের বন্ধু, আর কয়েকজনের নাম থাকল যারা গাছের শত্রু। যারা বন্ধু তাদের নাম গাছের আশেপাশে লেখো, আর যারা বন্ধু নয় তাদের নাম সরিয়ে অন্য একদিকে লেখো :

- লিপি
- মল্লিকবাবু
- টুসি
- মাঝিপাড়ার ছাগল
- সুধাদিদি
- বেনে বউ
- বড়ো দারোগা
- বাবুইগিন্নি
- পল্টন

- বিট্টু
- খরগোশ
- দোলন
- কাঠবেড়ালি
- শানুর বাবা
- কাঠুরে
- গাবলু
- সেপাই
- মল্লিকবাবুর বড়ো ছেলে

সাথি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তেপান্তর মাঠ—চারিদিকে ধুধু করছে, তার মাঝে একটি তালগাছ, সে একলা বাড়ল। দূরে দূরে মাঠ-ঘেরা বন, সেখানে লতাপাতা সব গলাগলি করে আছে দেখা যায়—ঘন নীল ছায়ার মতো। মাঠের চেয়ে বড়ো আকাশ—সেখানে তারা সব ঘেঁষাঘেঁষি ঝিলমিল করছে দেখা যায়—কেউ একা নেই। হাওয়া আসে, তার সঙ্গে আসে তার সাথি ফুলের গন্ধ। ঝড় আসে, তার সঙ্গে তার সাথি আসে আঁধি আর বৃষ্টি। মেঘ আসে, তার সঙ্গে আসে বিদ্যুল্লতা অপরূপ সুন্দরী!—সাথি ছাড়া কেউ নেই। শরতের মেঘ—তাদের সাথি হয়ে চলে বলাকা—পারিজাতের হারের মতো সার বেঁধে যায় দলে দলে সাথি আর সেথো তারা!

তালগাছ কেবলই তাদের ডাকে—পাতাগুলো নেড়ে নেড়ে; কিন্তু তাকে একলা রেখে যে-যার দৌড়ে পালায়, খেলতে ছোটে। তেপান্তর মাঠে একলা গাছ নিশ্বাস ফেলে—বৃথা আঁকুপাঁকু করে—তাদের সঙ্গে চলতে চায়—পারে না।

একদিন কোথা থেকে দুটি বাবুইপাখি সেই তালগাছের কাছে আসা-যাওয়া করতে লাগল। পাতার উপর বসে তারা দুটিতে মিছিমিছি কত কী বকাবকি করে। তারপর একদিন মাঠের থেকে কুটোকাটা নিয়ে তালগাছের প্রাণ যেখানে বাতাসে ঝিলমিল করে সেইখানে চমৎকার করে তাদের সুন্দর বাসাটি বেঁধে নেয়।

তালগাছ তাদের দোলা দেয় আর মনে মনে বলে—মিলল, সাথি মিলল!

তারপর একদিন খেলাঘর ছেড়ে ছোটো ছোটো পাখি তারা একে একে উড়ে যায়। সবুজ পাতার গাঁথা শূন্য বাসা নিয়ে তালগাছ দোলা দেয় আর চুপ করে কী যেন ভাবে থেকে থেকে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা একটি ছবি তোমাদের জন্য রইল।

হাতে কলমে

শব্দার্থ : তেপান্তর — তিনটি প্রান্তর যেখানে এসে মিলেছে, খুব বড়ো মাঠ। ধু ধু — ফাঁকা, শূন্য। ঝিলমিল — ঝিকমিক করা। সাথি — সঙ্গী, বন্ধু। আঁধি — ধূলিঝড়। বিদ্যুল্লতা — লতার মতো দেখতে বিদ্যুৎ, বিজলি। অপরূপ — যার রূপের তুলনা হয় না। বলাকা — পাখির ঝাঁক। পারিজাত — কাল্পনিক ফুল। সেথো — সঙ্গী, সাথি, বন্ধু। বৃথা — ব্যর্থ, বিফল। মিছিমিছি — শুধু শুধু, এমনি এমনি। কুটোকাটা — খড়কুটো, ডালপালা।

১. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১.১ তালগাছ কোথায় একলা বাড়ল?

১.২ ঘন নীল ছায়ার মতো কাদের দেখা যায়?

১.৩ মাঠের চেয়ে বড়ো কে?

১.৪ হাওয়ার সঙ্গে কে আসে?

১.৫ ঝড়ের সঙ্গে কে কে আসে?

১.৬ শরতের মেঘের সাথি কে?

১.৭ তালগাছ কেন বৃথা আঁকুপাঁকু করে?

১.৮ তালগাছের কাছে কারা যাওয়া আসা করতে লাগল?

১.৯ বাবুই পাখিরা কোথায় বাসা বাঁধল?

১.১০ তালগাছ চুপ করে ভাবে কেন?

২. উপযুক্ত শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও :

২.১ চারিদিকে ——— [ধু ধু / হু হু] করছে।

২.২ সেখানে লতাপাতা সব ———[দলাদলি / গলাগলি] করে আছে।

২.৩ সেখানে তারা সব ঘেঁষাঘেঁষি ———[ঝিলমিল / কিলবিল] করছে।

২.৪ তারা দুটিতে মিছিমিছি কত কী ———[হাঁকাহাঁকি / বকাবকি] করে।

২.৫ মাঠের থেকে ———[এঁটোকাঁটা / কুটোকাটা] নিয়ে বাসা বাঁধে।

৩. **নীচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করো :**

তেপান্তর, বলাকা, আঁকুপাঁকু, মিছিমিছি, ঝিলমিল।

৪. **একই অর্থের শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :**

নীড়, ভর্ৎসনা, গগন, প্রান্তর, বিজলি।

৫. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**

ঘন, দূরে, আছে, ছোটো।

৬. **'হার' শব্দটিকে দুটি আলাদা অর্থে ব্যবহার করে দুটি বাক্য লেখো।**

৭. **টীকা লেখো :** শরতের মেঘ, তালগাছ।

৮. **বর্ণ বিশ্লেষণ করো :** বিশ্বাস, কুটোকাটা, বলাকা, দুটি।

৯. **যুক্তাক্ষর রয়েছে এমন পাঁচটি শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো।**

১০. **বাক্য বাড়াও :**

১০.১ তার মাঝে একটি তালগাছ। (কোথায়? কেমন?)

১০.২ ঝড় আসে। (কাকে নিয়ে?)

১০.৩ তালগাছ কেবলই ডাকে। (কাদের? কীভাবে)

১০.৪ একলা গাছ বৃথা আঁকুপাঁকু করে। (কেন?)

১০.৫ তারপর একদিন তাদের সুন্দর বাসাটি বেঁধে নেয়। (কারা? কোথায়? কী দিয়ে?)

১১. শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তালগাছ' কবিতাটি এই পাঠের শেষে মিলিয়ে পড়ো।

১২. তোমার সবথেকে প্রিয় বন্ধু সম্বন্ধে চার-পাঁচটি বাক্য লেখো।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১ - ১৯৫১) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ বা অবন ঠাকুর ছিলেন খুব বড়ো মাপের একজন আঁকিয়ে। তিনি যেমন ভালো ছবি আঁকতেন, তেমন চমৎকার করে লিখতেও পারতেন। ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর বইগুলি বাঙালির অক্ষয় সম্পদ। বাংলাদেশের আচার-অনুষ্ঠান, ব্রতকথা, রূপকথা তাঁর লেখায় নতুন করে প্রাণ পেয়েছে। 'ক্ষীরের পুতুল', 'শকুন্তলা', 'রাজকাহিনী', 'নালক', 'বুড়ো আংলা', 'ভূতপত্‌রীর দেশ' ইত্যাদি তাঁর লেখা ছোটোদের কতগুলি বই। আর বড়োদের জন্য তিনি লিখেছেন 'ভারতশিল্প', 'বাংলার ব্রত', 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী', 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' ইত্যাদি।

১৩. নীচের ছবিদুটির মধ্যে অন্তত ছটি অমিল খুঁজে বের করো :

অঙ্কন : সুব্রত মাজী

সমাধান :

১. বাবুই পাখির বাসার সংখ্যা কম ২. তালগাছের সংখ্যা কম ৩. মেঘের সংখ্যা কম ৪. পাখির সংখ্যা কম ৫. কচু পাতার সংখ্যা কম ৬. ঘরের সংখ্যা কম।

সপ্তম পাঠ

একা একা থাকতে নেই

প্রচলিত গল্প

একদল পরি। তারা খোলা আকাশের নীচে গাছের ডালে ডালে থাকে। রোদে দেহ পুড়ে যায়, বৃষ্টিতে দেহ ভিজে যায়, শীতকালের হিমেল বাতাসে দেহ কাঁপতে থাকে। বড়ো কষ্ট।

এমনি করে দিন কাটে। একদিন তারা সবাই মিলে ঠিক করল, তারা বাড়ি তৈরি করবে। বাড়ির মধ্যে থাকলে আর কষ্ট হবে না। সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।

কয়েকজন পরি বলল, চলো আমরা গভীর বনে যাই। সেখানে একসঙ্গে অনেক বড়ো বড়ো মজবুত গাছ আছে। সেসব ডালে বাড়ি তৈরি করলে আর কোনো ভাবনা নেই।

দুজন পরি বলল, গভীর বনে যেতে যাব কেন? এই তো বেশ ফাঁকা ফাঁকা মাঠে গাছ রয়েছে, ওখানেই বাড়ি তৈরি করব।

কয়েকজন গভীর বনে চলে গেল। গাছের গুঁড়ি থেকে অল্প উঁচুতে কয়েকটা ডালের মাঝখানে সুন্দর বাড়ি তৈরি করল। আর কোনো কষ্ট নেই।

দুজন ফাঁকা মাঠে পাশাপাশি গাছে বাড়ি তৈরি করল। চারিদিকেই বেশ ফাঁকা, গভীর বনের মতো নয়।

এমনি করে দুই জায়গায় আনন্দে দিন কাটে, রাত কাটে। কোনো দুর্ভাবনাই নেই। তাদের মনে সব সময় খুশির হাওয়া।

সব দিন সমান যায় না। কখন যে বিপদ এসে পড়ে, কেউ বলতে পারে না। একদিন হলোও তাই। বড়ো বিপদ, আচমকা এসে পড়ল।

একদিন বিকেল থেকেই বৃষ্টি ঝরছে। তারপর এল বর্ষার রাত। হঠাৎ দমকা হাওয়া দিয়ে পাহাড়ি ঝড় শুরু হলো। হাওয়ার দাপটে সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। মাঠের গাছপালা কাঁপতে লাগল।

ঘন বনের মধ্যে একসঙ্গে অনেক গাছ। ফাঁকা জায়গা কম। তাই সেখানে ঝড়-ঝাপটা তেমন সুবিধে করতে পারল না। শুধু গাছের কয়েকটা ডাল ভেঙে পড়ল। বনের পরিদের বাড়ি বেঁচে গেল।

তারা বলল, সবার উচিত ঘন বনভূমির মতো একসঙ্গে মিলেমিশে থাকা, একা একা থাকলেই বিপদ। ওদের গাছগুলো আলাদা আলাদা ছিল, ভেঙে পড়ল। একা একা থাকতে নেই। তাতে শক্তি কমে যায়। একসঙ্গে থাকলে শক্তি বাড়ে।

হাতে কলমে

শব্দার্থ : একদল — একসঙ্গে অনেকজন। পরি — রূপকথার কল্পিত সুন্দরী মেয়ে, যাদের পাখির মতো ডানা আছে। হিমেল — ঠান্ডা। দুর্ভাবনা — খারাপ চিন্তা, দুশ্চিন্তা, উদ্‌বেগ। খুশির হাওয়া — আনন্দের অনুভূতি। বিপদ — সংকট, ঝঞ্ঝাট। আচমকা— চমকানি লাগে এমন, হঠাৎ। দমকা হাওয়া — হঠাৎ জোরে ছুটে আসা হাওয়া। দাপট — প্রতাপ। ওলট-পালট — সম্পূর্ণ বদল, বিপর্যয়। ঝড়-ঝাপটা — জোরালো বাতাসের ঢেউ ও হঠাৎ ধাক্কা। ঘন বন — গভীর অরণ্য। মিলেমিশে — সদ্‌ভাব, সম্প্রীতি। বনভূমি — বনের এলাকা। শক্তি— ক্ষমতা।

১. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১.১ পরিদের বাড়িতে থাকা সুবিধাজনক মনে হয়েছিল কেন?

১.২ বাড়ি তৈরির জায়গা নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া হলো কেন?

১.৩ তারপর তারা কী কী করল?

১.৪ বৃষ্টিতে পরিদের মাঠের গাছ-বাড়িগুলোর কী অবস্থা হলো?

১.৫ ঘন বনে ঝড়-ঝাপটা তেমন সুবিধা করতে পারল না কেন?

১.৬ বনের পরিদের বাড়ি কীভাবে বেঁচে গেল?

১.৭ একা একা থাকার বিপদ কোথায়?

এই লোককথাটি গড়ে উঠেছে কী করা উচিত আর কোনটা অনুচিত, তা গল্পের ছলে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। এখানে পরিদের আড়ালে মানুষের কথাই রয়েছে। তবে একতাই যে বল, আলাদা হয়ে থাকা বিপদের কারণ—এই গল্পে এই যে কথাটা বলা হয়েছে, সেটা সব দেশে, সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য।

২. বন্ধনীর মধ্যে থেকে ঠিক উত্তরটা বেছে লেখো :

২.১ পরির দল খোলা আকাশের নীচে (গাছের ডালে ডালে / গাছের কোটরে কোটরে) থাকে।

২.২ গাছের গুঁড়ি থেকে (অল্প / অনেক) উঁচুতে কয়েকজন পরি বাড়ি তৈরি করল।

২.৩ যেদিন ঝড় উঠল, সেদিন ছিল (বর্ষার রাত / শীতের রাত)।

২.৪ ঘন বনে গাছগুলো (কাছাকাছি / ছাড়াছাড়া হয়ে) থাকে।

২.৫ (একসঙ্গে / আলাদা ভাবে) থাকলে শক্তি বাড়ে।

৩. **পরি, পাহাড়ি ঝড় এবং গাছবাড়ি সম্পর্কে একটি করে বাক্য লেখো :**

৪. **সমার্থক শব্দ লেখো :**

বাড়ি, হাওয়া, গাছ, বন, হিমেল।

৫. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**

একদল, নীচে, ভিজে, দিন, সুখ, শান্তি, গভীর, অল্প, সুন্দর, খুশি, অনেক, আলাদা আলাদা

৬. **শূন্যস্থানে ঠিক শব্দ বসাও :**

৬.১ পরিরা গাছের ডালে______ (থাকে / থাকি)

৬.২ তারা বাড়ি তৈরি______ (করব / করবে)

৬.৩ একসঙ্গে থাকলে শক্তি______ (বাড়ে / বাড়ায়)

৭. **এলোমেলো বর্ণগুলিকে সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :**

ল ত কা শী, চ কা ম আ, ছ পা লা গা, মি ন ভূ ব, টা ঝ প ড় ঝা।

৮. **বর্ণ বিশ্লেষণ করো :**

আকাশ, চারিদিক, আনন্দ, বর্ষা, মিলেমিশে

৯. **অর্থ লেখো :**

দেহ, গভীর, দমকা, আচমকা, দুর্ভাবনা।

১০. **এলোমেলো শব্দগুলিকে সাজিয়ে বাক্য তৈরি করো :**

১০.১ নেই একা থাকতে একা।

১০.২ একসঙ্গে বনের অনেক ঘন গাছ মধ্যে।

১০.৩ হাওয়া খুশির মনে তাদের সবসময়।

১০.৪ চলে বনে গেল গভীর কয়েকজন।

১০.৫ একসঙ্গে বাড়ে থাকলে শক্তি।

১১. **গল্পের ঘটনাগুলি সাজিয়ে লেখো :**

১. তারা বলল, সবার উচিত ঘন বনভূমির মতো একসঙ্গে মিলেমিশে থাকা, একা একা থাকলেই বিপদ।

২. বনের পরিদের বাড়ি বেঁচে গেল।

৩. হঠাৎ দমকা হাওয়া দিয়ে পাহাড়ি ঝড় শুরু হলো।

৪. একদল পরি।...একদিন তারা সবাই মিলে ঠিক করল, তারা বাড়ি তৈরি করবে।

৫. দুজন পরি বলল, গভীর বনে যেতে যাব কেন? এই তো বেশ ফাঁকা ফাঁকা মাঠ রয়েছে, ওখানেই বাড়ি তৈরি করব।

১২. লক্ষ করো, এক শব্দের দুবার প্রয়োগ কীভাবে অনেক বোঝাচ্ছে। এইরকম জোড়া শব্দের অর্থ তুমি লেখো : (একটা করে দেওয়া হলো)

ডালে ডালে — অনেকগুলি ডালে।

বড়ো বড়ো

ফাঁকা ফাঁকা

১৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

১৩.১ পরিরা কোথায় থাকত ?

১৩.২ তাদের কী কারণে কষ্ট হতো ?

১৩.৩ কষ্ট থেকে রেহাই পেতে তারা কী ভাবল ?

১৩.৪ পরিরা কোথায় যেতে চাইল ?

১৩.৫ দুজন পরি কী বলল ?

১৩.৬ পরিরা কোথায় কোথায় তাদের বাড়ি তৈরি করেছিল ?

১৩.৭ সেখানে তাদের কীভাবে দিন কাটছিল ?

১৩.৮ 'সব দিন সমান যায় না' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?

১৩.৯ বর্ষার রাতে কী ঘটল ?

১৩.১০ 'ঘন বন' আর 'মাঠ' — এই দুই জায়গায় থাকা পরিদের কী দশা হলো ?

১৩.১১ শেষে ঘন বনের পরিরা কী বলল ?

আরাম

শঙ্খ ঘোষ

ঘুম ভেঙে দেখি আজ
পাখিদের কূজনে
বাবা আছে মা-ও আছে
দুই পাশে দুজনে।
ওই ঘরে ঘুমভরে
জিজি আছে বেঘোরে
পুতুলেরা টুংটাং
নেচে ওঠে এ ঘরে।

এদিকে আজান আর
ওইদিকে সিয়ারাম
সব আছে ঠিকঠাক
আঃ! আজ কী আরাম!
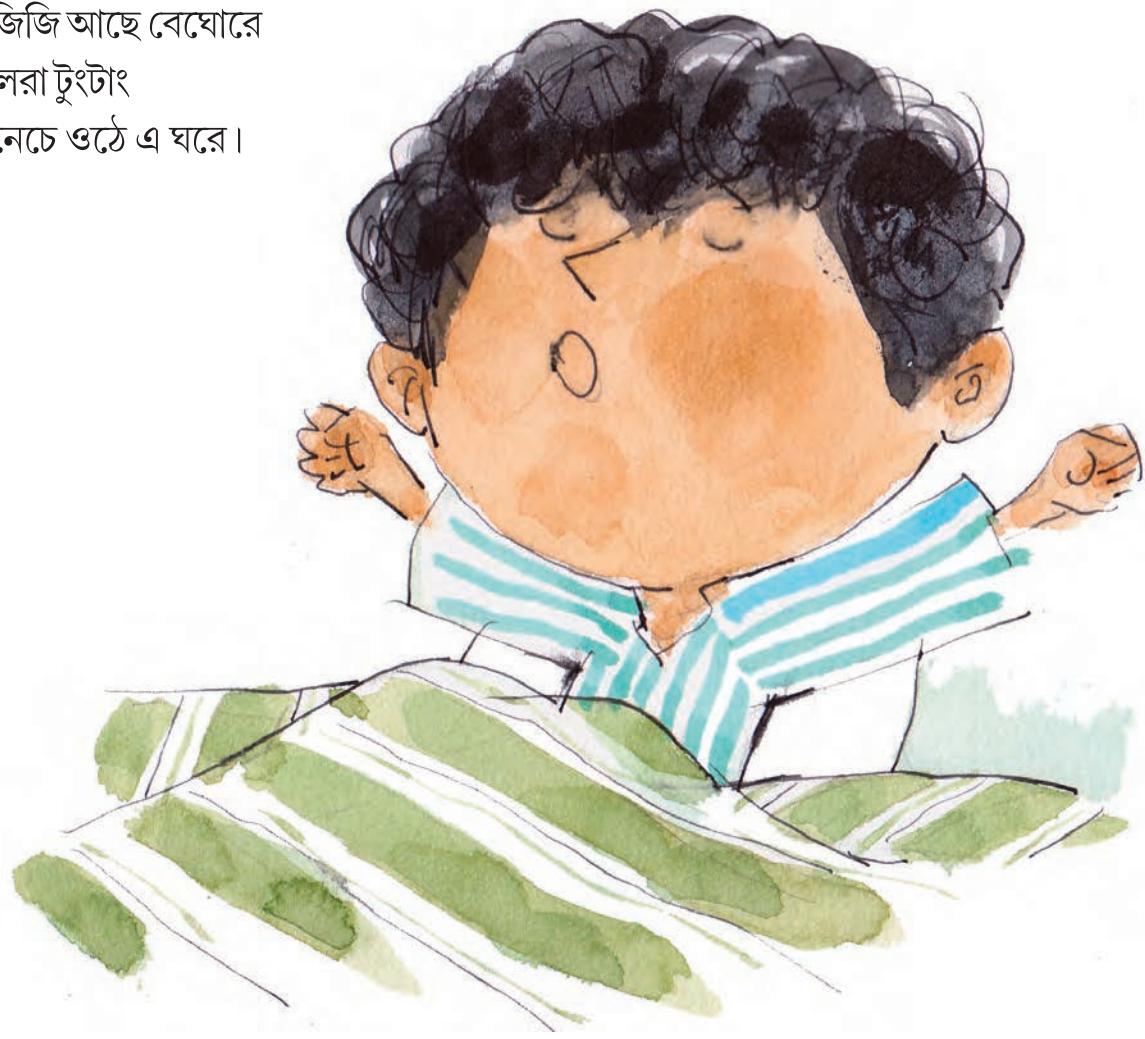
হাতে কলমে

১. **এক কথায় উত্তর দাও :**

১.১ কূজন কী?

১.২ কীভাবে ঘুম ভাঙল?

১.৩ ঘুম ভেঙে কী দেখা গেল?

১.৪ জিজি আর পুতুলেরা কী করছে?

১.৫ 'কী আরাম'— কখন এমন মনে হলো ?

১.৬ সব কিছু ঠিকঠাক মনে হলো কখন?

শব্দার্থ : কূজন — কাকলি, পাখির ডাক। জিজি — দিদি। বেঘোর — বেহুঁশ বা অচেতন। টুংটাং — একরকম আওয়াজ বা শব্দ, এখানে বাজনার শব্দ বোঝাচ্ছে। আরাম — স্বস্তি বোধ করা। সিয়ারাম — সীতারাম শব্দ থেকে এসেছে। আজান — নামাজ পড়ার জন্য আহ্বান ধ্বনি।

২. **যেটি ঠিক সেটি বেছে নিয়ে লেখো :**

২.১ কবিতাটিতে (ভোরবেলার / রাত্রিবেলার) কথা বলা হয়েছে।

২.২ পুতুলেরা (এঘরে / ওঘরে) নেচে উঠেছে।

২.৩ (আজ / কাল) কী আরাম।

৩. **কবিতাটি পড়ে বাক্য সম্পূর্ণ করো :**

৩.১ আজ ঘুম ভেঙে দেখি____।

৩.২ পুতুলেরা ____ নেচে ওঠে এ ঘরে।

৩.৩ ওইদিকে শোনা যায় ____ ।

৩.৪ ওই ঘরে জিজি ____ ঘুমায়।

৪. **শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করো :**

কূজন, টুংটাং, বেঘোরে, আরাম

৫. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :**

ঘুম, ভেঙে, ঘরে, আজ, ওঠে।

৬. **শব্দঝুড়ি থেকে উপযুক্ত শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও :**

৬.১ রোজ সকালে আমাদের ঘুম ____ ।

৬.২ বাবা-মা আমাদের ____ ।

৬.৩ আনন্দে মন ____ ওঠে।

৬.৪ প্রচণ্ড গরমে ____ নেই।

আরাম, ভাঙে, ভালোবাসেন, নেচে

শঙ্খ ঘোষ (জন্ম ১৯৩২) : বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘দিনগুলি রাতগুলি’। এছাড়াও লিখেছেন ‘নিহিত পাতাল ছায়া’, ‘বাবরের প্রার্থনা’, ‘পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ’ইত্যাদি। ছোটোদের জন্য লিখেছেন— ‘ছোট্ট একটা স্কুল’, ‘অল্পবয়স কল্পবয়স’, ‘শব্দ নিয়ে খেলা’, ‘সকালবেলার আলো’, ‘সুপুরি বনের সারি’, ‘শহর পথের ধুলো’ ইত্যাদি। প্রবন্ধের বই হিসেবে ‘কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক’, ‘ছন্দোময় জীবন’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৭. কোন কোন পাখির ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙে?

৮. সকালে উঠে কীভাবে তুমি দিন শুরু করো, চার-পাঁচটি বাক্যে লেখো।

____

____

____

____

____

____

হিংসুটি

সুকুমার রায়

এক ছিল দুষ্টু মেয়ে — বেজায় হিংসুটে, আর বেজায় ঝগড়াটি। তার নাম বলতে গেলেই তো মুশকিল, কারণ ঐ নামে শান্ত লক্ষ্মী পাঠিকা যদি কেউ থাকে, তারা তো আমার উপর চটে যাবে।

হিংসুটির দিদি বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে—যেমন কাজে কর্মে, তেমনি লেখাপড়ায়। হিংসুটির বয়েস সাত বছর হয়ে গেল, এখনও তার প্রথম ভাগই শেষ হলো না— আর তার দিদি তার চাইতে মোটে এক বছরের বড়ো, সে এখনই 'বোধোদয়' আর 'ছেলেদের রামায়ণ' পড়ে ফেলেছে। ইংরেজি ফার্স্টবুক তার কবে শেষ হয়ে গেছে। হিংসুটি কিনা সবাইকে হিংসে করে, সে তো দিদিকেও হিংসে করত। দিদি স্কুলে যায়, প্রাইজ পায়—হিংসুটি খালি বকুনি খায় আর শাস্তি পায়।

দিদি যে-বার ছবির বই প্রাইজ পেল আর হিংসুটি কিচ্ছু পেলে না, তখন যদি তার অভিমান দেখতে! সে সারাটা দিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে গাল ফুলিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে বসে রইল—কারও সঙ্গে কথাই বলল না। তারপর রাত্রিবেলায় দিদির অমন সুন্দর বইখানাকে কালি ঢেলে, মলাট ছিঁড়ে, কাদায় ফেলে নষ্ট করে দিল। এমন দুষ্টু হিংসুটি মেয়ে!

হিংসুটির মামা এসেছেন, তিনি মিঠাই এনে দু-বোনকেই আদর করে খেতে দিয়েছেন। হিংসুটি খানিকক্ষণ তার দিদির খাবারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। মামা ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কী রে, কী হলো? জিভে কামড় লাগল নাকি?' হিংসুটির মুখে আর কথা নেই, সে কেবলই কাঁদছে। তখন তার মা এক ধমক দিয়ে বললেন 'কী হয়েছে বল না!' তখন হিংসুটি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'দিদির ঐ রসমুন্ডিটা আমারটার চাইতেও বড়ো।' তাই শুনে দিদি তাড়াতাড়ি নিজের রসমুন্ডিটা তাকে দিয়ে দিল। অথচ হিংসুটি নিজে যা খাবার পেয়েছিল তার অর্ধেক সে খেতে পারল না—নষ্ট করে ফেলে দিল। দিদির জন্মদিনে দিদির জন্য নতুন জামা, নতুন কাপড় এলে হিংসুটি তাই নিয়ে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে তোলে।

একদিন হঠাৎ হিংসুটি তার মায়ের আলমারি খুলে দেখে কী— লাল জামা গায়ে, লাল জুতো পায়ে, টুকটুকে রাঙা পুতুল বাক্সের মধ্যে শুয়ে আছে। হিংসুটি বলল, 'দেখেছ! দিদি কী দুষ্টু! নিশ্চয়ই মামার কাছ থেকে পুতুল আদায় করেছে– আবার আমায় না দেখিয়ে মায়ের কাছে লুকিয়ে রাখা হয়েছে!' তখন তার ভয়ানক রাগ হলো। সে ভাবল, 'আমি তো ছোটো বোন, আমারই তো পুতুল পাওয়া উচিত। দিদি কেন মিছিমিছি পুতুল পাবে?' এই ভেবে সে পুতুলটাকে উঠিয়ে নিল।

কী সুন্দর পুতুল! কেমন মিটমিটে চোখ, আর ফুটফুটে মুখ, কেমন কচি কচি হাত পা, আর টুকটুকে জামা কাপড়! যত সব ভালো ভালো জিনিস সব কিনা দিদি পাবে! হিংসুটির চোখ ফেটে জল এল। সে রেগে পুতুলটাকে আছড়িয়ে মাটিতে ফেলে দিল। তাতেও তার রাগ গেল না; সে একটা ডান্ডা নিয়ে ধাঁই ধাঁই করে পুতুলটাকে মারতে লাগল। মারতে মারতে তার নাক মুখ হাত পা ভেঙে, তার জামা কাপড় ছিঁড়ে—আবার তাকে বাক্সের মধ্যে ঠেসে সে রাগে গরগর করতে করতে চলে গেল।

বিকেলবেলা মামা এসে তাকে ডাকতে লাগলেন আর বললেন, 'তোর জন্য কী এনেছি দেখিসনি?' শুনে হিংসুটি দৌড়ে এল, 'কই মামা? কী এনেছ দাও না।'

মামা বললেন, 'মার কাছে দেখ গিয়ে কেমন সুন্দর পুতুল এনেছি।' হিংসুটি উৎসাহে নাচতে লাগল, মাকে বলল, 'কোথায় রেখেছ মা?' মা বললেন, 'আলমারিতে আছে।' শুনে ভয়ে হিংসুটির বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করে উঠল। সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'সেটার কি লাল জামা আর লাল জুতো পরানো—মাথায় কালো কালো কোঁকড়ানো চুল ছিল?' মা বললেন, 'হ্যাঁ। তুই দেখেছিস নাকি?'

হিংসুটির মুখে আর কথা নেই! সে খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে তারপর একেবারে ভ্যাঁ করে কেঁদে এক দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

এরপরে যদি তার হিংসে আর দুষ্টুমি না কমে, তবে আর কী করে কমবে?

হাতে কলমে

১. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

১.১ হিংসুটির নাম বলা মুশকিল কেন?

১.২ হিংসুটির দিদি কেমন মেয়ে?

১.৩ হিংসুটির বয়স কত?

১.৪ হিংসুটির দিদির বয়স কত?

১.৫ হিংসুটির দিদি কী কী পড়ে ফেলেছে?

১.৬ স্কুলে কে কেমন ফল করত?

১.৭ দিদি ছবির বই প্রাইজ পেলে হিংসুটি কী করল?

১.৮ হিংসুটি দিদির খাবারের দিকে তাকিয়ে কাঁদল কেন?

১.৯ দিদির জন্মদিনে হিংসুটি কী করে?

১.১০ একদিন হঠাৎ হিংসুটি মায়ের আলমারি খুলে কী দেখল?

১.১১ হিংসুটির ভয়ানক রাগ হলো কেন?

১.১২ কেন হিংসুটির চোখ ফেটে জল এল?

১.১৩ কে, কাকে ডান্ডা দিয়ে ধাঁই ধাঁই করে মারতে লাগল?

১.১৪ মারার পর সে কী করল?

১.১৫ মামা কখন হিংসুটিকে ডাকতে লাগলেন?

১.১৬ মামা হিংসুটিকে ডেকে কী বললেন?

১.১৭ হিংসুটির বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করে উঠল কেন?

১.১৮ সে কাঁদো কাঁদো গলায় কী বলল?

১.১৯ হিংসুটির কথা শুনে মা কী বললেন?

১.২০ হিংসুটি ভ্যাঁ করে কেঁদে একদৌড়ে পালিয়ে গেল কেন?

সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩): ‘আবোল তাবোল’, ‘হযবরল’, ‘পাগলা দাশু’ ইত্যাদির স্রষ্টা সুকুমার রায়। পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। প্রত্যেক বাঙালির শৈশবে জড়িয়ে আছেন এই কবি ও সাহিত্যিক। চিত্রশিল্প, ফটোগ্রাফি, সরস ও কৌতুককর কাহিনি এবং ছড়া রচনায় সুকুমার রায় অতুলনীয়। তাঁর রচিত অন্যান্য বই— ‘খাই খাই’, ‘অবাক জলপান’, ‘ঝালাপালা’, ‘লক্ষ্মণের শক্তিশেল’ ইত্যাদি। স্বল্পদিনের জীবনে তিনি যা সৃষ্টি করে গেছেন তা থেকে বাঙালি জাতি চিরদিন অনাবিল আনন্দের স্বাদ পাবে।

২. ‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও :

ক	খ
মিটমিটে	জামাকাপড়
ফুটফুটে	গলা
কচি কচি	চোখ
টুকটুকে	মুখ
কাঁদো কাঁদো	হাত পা

শব্দার্থ : হিংসুটে — যে অন্যকে হিংসে করে। ঝগড়াটি — যে খালি ঝগড়া করে। প্রাইজ — পুরস্কার। রসমুন্ডি –– একরকমের মিষ্টি। ডান্ডা — লাঠি।

৩. **উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৩.১ হিংসুটি তার দিদির খাবারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভ্যাঁ করে ________ (কেঁদে ফেলল / হেসে ফেলল / খেয়ে ফেলল)।

৩.২ সে একটা ডান্ডা দিয়ে ধাঁই ধাঁই করে পুতুলটাকে ________ (আদর করল / মারতে লাগল / স্নান করাল)।

৩.৩ সে ________ (আনন্দে / দুঃখে / রাগে) গরগর করতে করতে চলে গেল।

৩.৪ শুনে ________ (হিংসায় / ভয়ে / করুণায়) হিংসুটির বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল।

৩.৫ সে কাঁদো কাঁদো ________ (গলায় / মুখে / চোখে) বলল।

৩.৬ সে খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে ________ (শুনে / তাকিয়ে / ছুঁয়ে) একদৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

৪. **কোনটি বেমানান খুঁজে বের করে গোল দাগ দাও :**

৪.১ দুষ্টু, শান্ত, হিংসুটে, ঝগড়াটি।

৪.২ বোধোদয়, ছেলেদের রামায়ণ, রসমুন্ডি, ইংরেজি ফার্স্টবুক।

৪.৩ নাচতে নাচতে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, গাল ফুলিয়ে, ঠোঁট বাঁকিয়ে।

৪.৪ মা, মামা, দিদি, হিংসুটি।

৪.৫ বাক্স, আলমারি, মলাট, পুতুল।

৫. হিংসুটির দিদিকে ‘লক্ষ্মী মেয়ে’ বলা হয়েছে কেন?

৬. মামার দেওয়া পুতুলটা কেমন ছিল? সেটা কোথায় রাখা ছিল?

৭. তুমি কি হিংসুটির মতো হতে চাও? কেন চাও বা চাও না, তা লেখো।

৮. ‘হিংসে করা ভালো নয়’ — এই বিষয়ে পাঁচটি বাক্য লেখো।

৯. নীচের সূত্রগুলি কাজে লাগিয়ে খেলাটি খেলো :

		১০. ই		রে		ফা		বু	
							৯. ম		ট
					৮. রা			ণ	
৭.	ভে	কা							
					৬. বি			বে	
			৫.	ত			র		
	৪.		স	ধ					
					৩.	ঙা			ল
						২.	ধো	দ	
১. টু		টু			মা				
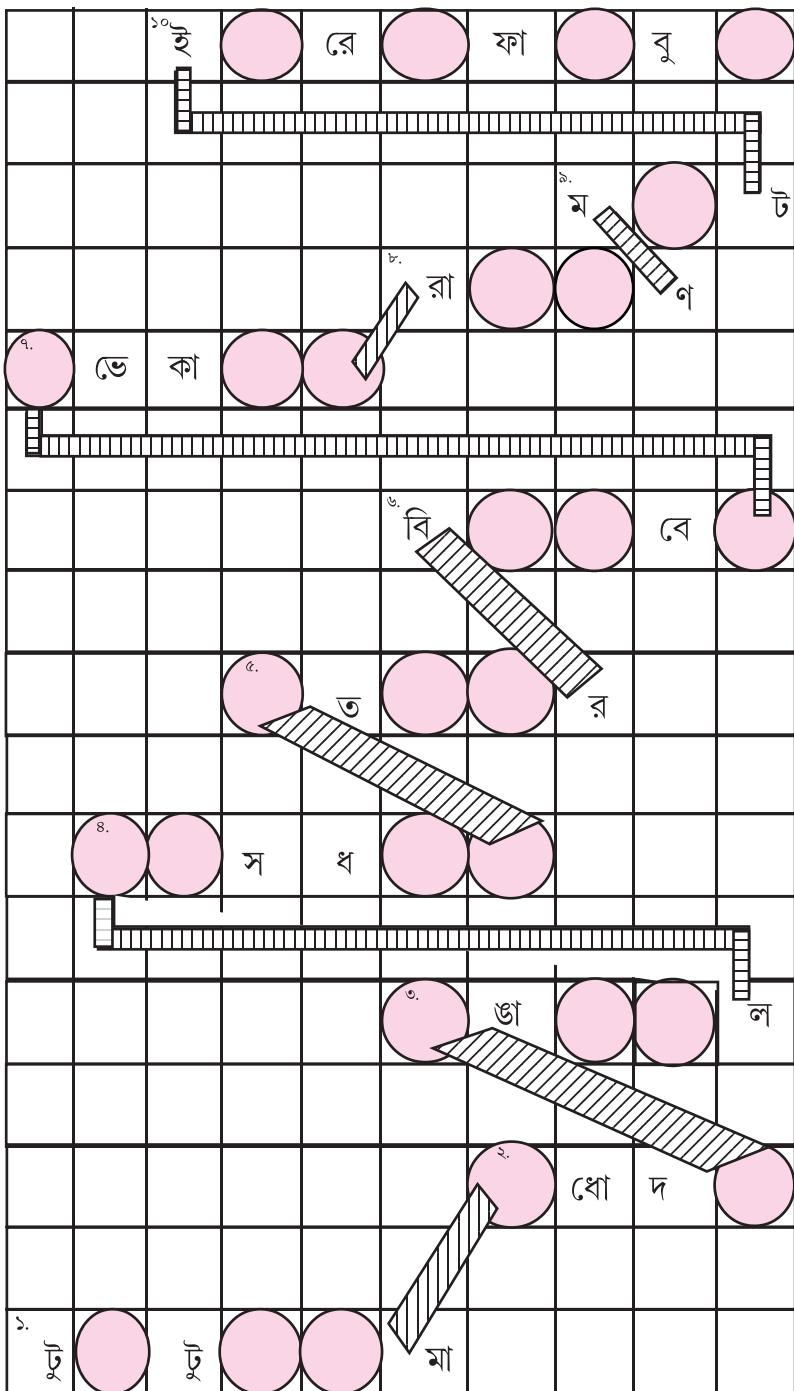
সূত্র:

১. পুতুলের গায়ে ছিল__________।

২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা একটি বই।

৩. বাক্সের মধ্যে শুয়েছিল _________।

৪. 'শুনে ভয়ে হিংসুটির বুকের মধ্যে _________ করতে লাগল।'

৫. হিংসুটির বয়স ছিল _________।

৬. '_________ মামা এসে তাকে ডাকতে লাগলেন।'

৭. '_________ লাগল নাকি?'

৮. 'ছেলেদের _________।'

৯. '_________ ছিঁড়ে, কাদায় ফেলে নষ্ট করে দিল।'

১০. '_________ তার কবে শেষ হয়ে গেছে।'

সমাধান :

১. টুকটুকে জামা, ২. বোধোদয়, ৩. রাঙাপুতুল, ৪. ধড়াসধড়াস, ৫. সাত বছর, ৬. বিকেলবেলা, ৭. জিভে কামড়, ৮. রামায়ণ, ৯. মলাট, ১০. ইংরেজি ফার্স্টবুক।

১০. হিংসুটি আর হিংসে করে না। সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকে সে। তাকে সাহায্য করো দেখি, যাতে এবার সে পুতুলটাকে খুঁজে পায়।
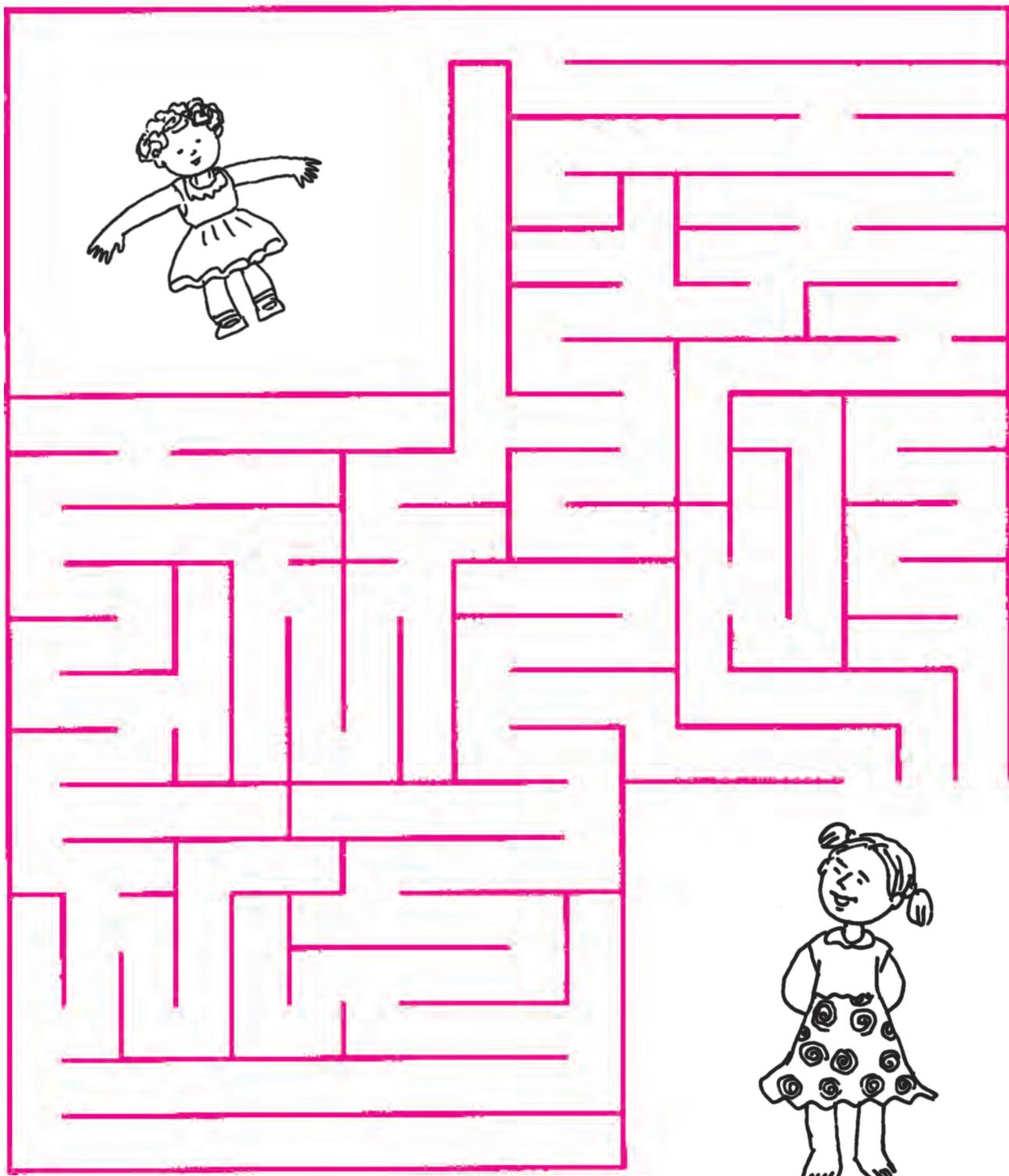
মনকেমনের গল্প

নবনীতা দেবসেন

এই বিষ্টি বিষ্টি দিনগুলো ভীষণ ভালো লাগে রুবাইয়ের। অন্ধকার মেঘলা করে আছে, সকাল থেকেই আকাশ আঁধার, তার ভেতর থেকে ফুটে বেরুচ্ছে একটু একটু আলোর ছটা। আলো, কিন্তু রোদ নয়। বিষ্টি হব-হব, কিন্তু হচ্ছে না। গাছগুলো সব কান খাড়া করে রেডি হয়ে আছে বিষ্টির পায়ের শব্দ শুনবে বলে। রুবাইয়ের যে কী ভালো লাগে এরকম দিন। 'মেঘছায়ে সজলবায়ে' দিন এগুলো। এমন দিনে একটুও পড়ায় মন বসে না। তবু ইসকুলে তো যেতেই হয়। ক্লাসরুমের জানলা দিয়ে চোখ ডানা মেলে কেবলই উড়ে যায় আকাশে। কেমন একটা উদাস উদাস ভাব চারিদিকেই। বাতাস বইছে অল্প অল্প। মা বললেন, 'দূরে কোথাও বিষ্টি পড়ছে,' কিন্তু এখানে আকাশটা কেমন ভারী ভারী, যেন বিষ্টি পড়ো-পড়ো হয়ে রয়েছে সারাটা দিন। মিষ্টি-মিষ্টি একটা ভাব চারিদিকে।

রাস্তার গাছেদের আজ বেশ খুশি-খুশি দেখাচ্ছে। গরমকালের রোদ্দুরে এই গাছেদেরই কীরকম ধুলোভরা, ক্লান্তি, আর মনখারাপের মতন চেহারা হয়ে যায়। গাছেদেরও মেঘলা দিন পছন্দ, এমনি ছায়াভরা দিন পছন্দ। অথচ রোদ্দুর না উঠলে তো ওরা ক্লোরোফিল তৈরি করতে পারবে না। পাতাও সবুজ হবে না। কিন্তু সেটার জন্যে অত কড়া রোদ্দুর নিশ্চয় লাগে না। বোধ হয় ভোরের নরম আলোতেই গাছেরা সব জরুরি ক্লোরোফিল তৈরি করে নেয়।

এই ছায়াঘন, আলো-আঁধারির দিনে, দিনের বেলাতে আলো জ্বালাতে হয় ক্লাসের ঘরে। এমন দিনে কার ইচ্ছে করে ইসকুলে যেতে? কিন্তু ‘মেঘলা দিনের ছুটি’ বলে তো কিছু হয় না। আন্টিদেরও নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে না পড়াতে। তবুও কেন যে ইসকুল খোলা থাকে! আজ অবশ্য ছুটি। ইসকুলে গিয়ে যদি কেবল খেলার মাঠেই থাকা যেত। ছুটে বেড়ানো যেত মাঠের মধ্যে।

সেই যে গানটার সঙ্গে মা নাচ শিখিয়েছিলেন—‘মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি— আ-হা-হা হা হা—’ সেটা ঠিক আজকের দিনের উলটো একটা দিনের গান। অনেকদিন বিষ্টিবাদলার পরে প্রথম যেদিন রোদের মুখ দেখা যায়, সেদিনটাও খুব আনন্দের। কিন্তু আনন্দের ধরনটা একই।

‘কী করি আজ ভেবে না পাই/পথ হারিয়ে কোন বনে যাই/কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই সকল ছেলে জুটি— আ-হা-হা হা হা।’

কলকাতা শহরে তো বনজঙ্গল নেই যে ‘পথ হারিয়ে কোন বনে যাই’ মনে হবে। কিন্তু ‘পথ হারিয়ে কোনখানে যাই’ হতে পারে। অন্য কোথাও খুব যেতে ইচ্ছে করে এই সময়টাতে। চেনা জিনিসগুলো সব অচেনা দেখায়। গোটা পাড়াটাকে মনে হয় অন্য রাস্তা। অন্য দেশ। রুবাইয়ের ইচ্ছে করে সারাক্ষণ ছাদে দৌড়োদৌড়ি করতে। কিংবা বারান্দায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখতে, আকাশ দেখতে। কিংবা জানলায় চুপ করে বসে থাকতে। কী মিষ্টি একটা বাতাস দিচ্ছে! রুবাইয়ের ইচ্ছে করল ছোটোমামুর দেওয়া সুন্দর বাঁধানো খাতাটাতে কিছু লিখতে।

রুবাই লিখল—

‘আজ ছুটি। আজ ১৫ই আগস্ট। ইসকুলে ফ্ল্যাগ তোলা হলো সকালে, তারপরেই ছুটি। সকালবেলাই ইসকুল থেকে ফিরে এসেছি। এমন ছায়াভরা আকাশে যখন ফ্ল্যাগটা উড়ল, আমরা ‘জনগণমন’... গান গাইলাম। তখনই কী আশ্চর্য, বিরাট এক ঝাঁক ধবধবে সাদা পাখি ঠিক তক্ষুনি আকাশ দিয়ে, ফ্ল্যাগের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। অনেক দূর দেশ থেকে আসছে হয়তো। আরো অনেক দূরের দেশে যাচ্ছে। কী সুন্দর যে দেখিয়েছিল পাখির ঝাঁকটাকে আকাশে। সেই পতাকা ওড়ানোটাকেই যেন স্যালুট করে গেল ওরা। খুব সুন্দর কিচির-মিচির আওয়াজ করতে করতে উড়ে গেল ওই বলাকা, অত ওপর দিয়ে যাচ্ছে তবু শোনা গেল ওদের কাকলি-কূজন।’

পাখির কিচির-মিচিরকেই বলে ‘কাকলি-কূজন’। আর ওই সাদা পাখির ঝাঁককেই বলে ‘বলাকা’। রুবাই এইসব শব্দগুলো জানে। দিম্মা বলে দিতেন। এতটা লিখে রুবাই খাতা বন্ধ করে ফেলল। আজ সক্কলকার ছুটি। বাবার ছুটি, মার ছুটি, রুবাইয়েরও ছুটি। রুবাইয়ের ইসকুলের অবশ্য ছুটিই বা কী, খোলাই বা কী! ওদের তো কেবল খেলা আর গান, গান আর খেলা। আর টিফিন খাওয়া। এই তো ইসকুল রুবাইদের।

হাতে কলমে

শব্দার্থ : বিষ্টি — বৃষ্টি । স্যালুট করা — অভিবাদন জানানো। আঁধার — অন্ধকার। কূজন — পাখির ডাক। মেঘছায়ে — মেঘের ছায়ায়। কাকলি — পাখির ডাক। সজল — জলপূর্ণ। বলাকা — সাদা পাখির ঝাঁক। ক্লোরোফিল — গাছের পাতার একটি উপাদান, যা থাকে বলে পাতার রং হয় সবুজ। জরুরি — দরকারি। ফ্ল্যাগ — পতাকা।

১. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দাও :**

১.১ বৃষ্টির দিনগুলো রুবাইয়ের এত ভালো লাগে কেন?

১.২ আমাদের জাতীয় সংগীত কোনটি?

১.৩ ১৫ আগস্ট দেশ জুড়ে জাতীয় পতাকা তোলা হয় কেন?

১.৪ ইসকুল রুবাইয়ের কেমন লাগে?

১.৫ ‘বলাকা’ বলতে কী বোঝো?

১.৬ শক্ত শব্দের মানে রুবাইকে কে বলে দিতেন?

১.৭ রুবাইয়ের লেখার খাতা কে দিয়েছিলেন? খাতাটি কেমন?

১.৮ লেখার খাতায় রুবাই কোন দিনের কথা লিখেছিল?

১.৯ আমাদের দেশের জাতীয় পতাকায় কটি রং আছে? সেগুলি কী কী?

১.১০ রুবাই খাতায় যা লিখেছিল, তা তুমি নিজের ভাষায় লেখো।

নবনীতা দেবসেন (জন্ম ১৯৩৮) : কবি নরেন্দ্র দেব ও কবি রাধারাণী দেবীর কন্যা। কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, ভ্রমণকাহিনি রচয়িতা। ‘প্রথম প্রত্যুষ, ‘স্বাগত দেবদূত’,‘আমি অনুপম’,‘করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে’ ইত্যাদি বিশিষ্ট রচনার রচয়িতা। কৌতুকপ্রবণতা এবং অন্তরঙ্গ রচনাভঙ্গি তাঁর বৈশিষ্ট্য।

২. **নির্দেশ অনুসারে লেখো :**

রুবাই বৃষ্টির দিনে যা যা করতে চায়	তুমি বৃষ্টির দিনে যা যা করতে চাও
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.

৩. **এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :**

র চি মি চি কি র, ক ন কৃ লি কা জ, লো ধা আঁ রি আ, র ল ম গ কা, দ বৃ বা ষ্টি লা।

৪. **বর্ণ বিশ্লেষণ করো :**

বিষ্টি, ক্লোরোফিল, সারাক্ষণ, আশ্চর্য, সুন্দর।

৫. **বাক্য রচনা করো :**

অন্ধকার, রোদ্দুর, মেঘলা, বনজঙ্গল, সাদা।

৬. **'অল্প'— এই শব্দটিতে যেমন 'ল্প' আছে, এরকম তিনটি শব্দ লেখো যেখানে 'ল্প' রয়েছে।**

৭. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৭.১ এই গল্পে 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে' গানটির নাচ রুবাই শিখেছে। গানটি কার লেখা ?

৭.২ বৃষ্টির সময় চারিদিকের পরিবেশ কেমন হয়ে যায় কয়েকটা বাক্যে লেখো।

৭.৩ তোমরা তোমাদের স্কুলে স্বাধীনতা দিবস কেমন করে পালন করো ? কী কী অনুষ্ঠান হয় ? সকলে মিলে তোমরা কোন গান গাও ?

৭.৪ বৃষ্টির দিনে রাস্তার গাছেদের খুশি খুশি দেখায় কেন ?

৭.৫ এমন একটা দিনের কথা লেখো যে দিন খুব বৃষ্টির জন্য তোমার স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

৮. বৃষ্টি নিয়ে লেখা তোমার জানা কোনো ছড়া বা কবিতা লেখো।

দেশের মাটি

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

মধুর চেয়েও আছে মধুর
সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধুলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি।
চন্দনেরি গন্ধে ভরা,-
শীতল করা, ক্লান্তি-হরা,
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখানটিতেই শীতল-পাটি।
শিয়রে তার সূর্য এসে
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে,
নিদ্‌-মহলের জ্যোৎস্না নিতি
বুলায় পায়ে রূপার কাঠি!
নাগের বাঘের পাহারাতে
হচ্ছে বদল দিনে রাতে,
পাহাড় তারে আড়াল করে,
সাগর সে তার ধোয়ায় পা'টি।
মউল ফুলের মাল্য মাথায়
লীলা কমল গন্ধে মাতায়,
পাঁয়জোরে তার লবঙ্গ ফুল
অঙ্গে বকুল আর দোপাটি।
নারিকেলের গোপন কোশে
অন্ন পানি জোগায় গো সে,
কোল ভরা তার কনক ধানে
আটটি শিষে বাঁধা আঁটি।
সে যে গো নীল-পদ্ম-আঁখি
সেই তো রে নীলকণ্ঠ পাখি,—
মুক্তি-সুখের বার্তা আনে
ঘুচায় প্রাণের কান্নাকাটি।

হাতে কলমে
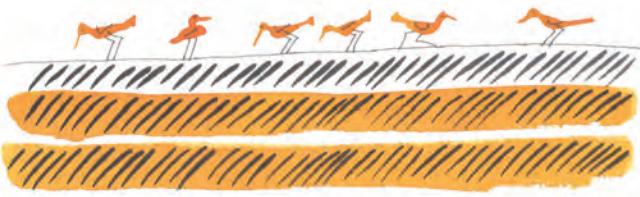
শব্দার্থ : শীতল — ঠান্ডা। নাগ — সাপ। ক্লান্তিহরা — যা ক্লান্তি দূর করে। মাল্য — মালা। খাঁটি — বিশুদ্ধ। কমল — পদ্মফুল। অঙ্গ — শরীর। পাঁয়জোর — নূপুর। শিয়র — মাথা। কনক — সোনা। নিদ্-মহল — ঘুমের প্রাসাদ। অন্নপানি — খাবার ও জল, এক কথায় খাদ্য। নিতি — নিত্য, রোজ। বার্তা — খবর।

১. **নীচের প্রশ্নগুলির দু-এক কথায় উত্তর দাও :**

১.১ তোমার দেশ কোনটি?

১.২ সেই দেশটি কেমন?

১.৩ দেশে থাকতে কবির কেমন লাগে?

১.৪ এই কবিতায় এমন একটি ফলের কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে খাবার এবং জল— দুটোই থাকে। কোন ফল তা লেখো।

১.৫ ধানকে এখানে কনক বা সোনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কেন?

১.৬ কবিতায় কবি কোন পাহাড়ের কথা বলতে চেয়েছেন, যা আমাদের দেশকে সুরক্ষিত রাখে?

২. কবিতাটি কার লেখা? এই কবির লেখা 'বাংলাদেশ' আর কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা 'সকল দেশের সেরা' কবিতা দুটি শিক্ষকের থেকে শুনে নাও।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২ - ১৯২২) : বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অন্যতম জনপ্রিয় কবি। 'ছন্দের যাদুকর' নামে বিখ্যাত। উল্লেখযোগ্য কবিতার বই - 'সবিতা', 'সন্ধিক্ষণ', 'বেণু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা', 'তুলির লিখন', 'অভ্র-আবীর' প্রভৃতি। নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধের বই লিখেছেন, অনুবাদ করেছেন বহু কবির অজস্র কবিতা। সংস্কৃত, ইংরেজি ও অন্যান্য কোনো কোনো বিদেশি ভাষার ছন্দ বাংলায় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। বাংলা দেশের জীবন এবং গ্রাম আর প্রকৃতির নিবিড় পরিচয় তাঁর কবিতার জগৎকে গড়ে তুলেছে।

৩. ঠিক শব্দটির উপরে (√) চিহ্ন বসাও :

৩.১ মাথায় সূর্য এসে (সোনার/রূপার/তামার) কাঠি ছোঁয়ায়।
৩.২ (পাহাড়/ বন/সাগর) সে তার ধোয়ায় পা'টি।
৩.৩ দেশের কোল ভরে আছে (কনক/আমন/রঙিন) ধান।
৩.৪ গন্ধে মাতায় (লীলা/নীল/লাল) কমল।

৪. নীচে কতগুলি পঙ্‌ক্তি দেওয়া হলো যেগুলি পদ্যে লেখা। এগুলোকে গদ্য ভাষায় লেখো।

৪.১ 'পাহাড় তারে আড়াল করে, সাগর সে তার ধোয়ায় পা'টি।'
৪.২ 'আমার দেশের পথের ধুলা খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি।'
৪.৩ সে যে গো নীল পদ্ম আঁখি সেই তো রে নীলকণ্ঠ পাখি।'

৫. কবিতাটির প্রতিটি পঙ্‌ক্তির শেষে যে শব্দগুলি কবি ব্যবহার করেছেন, তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মিল রয়েছে। এই মিলে যাওয়া শব্দগুলিকে খুঁজে বের করে লেখো :

(যেমন : মাটি এবং খাঁটি, ভরা ও হরা।)

৬. নীচে দেওয়া শব্দগুলির সঙ্গে মিলিয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করো :

শব্দ	তোমাদের তৈরি শব্দ
নীল মনে যায় সোনা পানি	

৭. শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য দেখাও:

ধোয়া	পাটি	খাটি
ধোঁয়া	পা'টি	খাঁটি

৮. যুক্তাক্ষর রয়েছে, এমন পাঁচটি শব্দ কবিতাটি থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো।

৯. কে কোন কাজটি করে লেখো : সূর্য, পাহাড়, সাগর, নাগ, বাঘ, নীলকণ্ঠ পাখি।

১০. নিজের ভাষায় নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো।

১০.১ কবিতাটিতে দেশের রূপবর্ণনায় কবি কোন কোন ফুলের নাম করেছেন?
১০.২ সেইসব ফুল দেশকে কীভাবে সাজিয়েছে?
১০.৩ দেশের প্রতি তোমার অনুভূতির কথা চার-পাঁচটি বাক্যে লেখো।

কীসের থেকে কী যে হয়

প্রচলিত গল্প

অনেক দিন আগে এক সুন্দর বন ছিল। কত রকমের পাখি, কত জীবজন্তু। সবুজ গাছে-ঢাকা সেই বনের মধ্যে এদিকে-ওদিকে কয়েকটি গ্রাম। সে সব গ্রামে থাকে গৃহস্থ মানুষ। চাষ করে, ফলমূল জোগাড় করে, বনের মধু খেয়ে, কাঠ কেটে বড়ো সুখে তাদের দিন চলে যায়। বর্ষায় তিরতির করে যে বয়ে চলে পাহাড়ি নদী, সেই জলে কত ছোটো ছোটো মাছ। কোনো কিছুরই অভাব নেই।

সকালে কিছু খেয়ে কিশোরী মেয়েরা বনে কাঠ কাটতে যায়। ফিরে আসে দুপুরে। উনুন জ্বালাবার কাঠ। সবই শুকনো ডাল। কিছু শুকনো ডাল থাকে গাছে, কিছু পড়ে থাকে গাছের নীচে মাটিতে।

একদিন এক কিশোরী যেই গাছের শুকনো ডালে হাত রেখে শুকনো ডাল ভাঙতে যাবে, অমনি একটা কাঠপিঁপড়ে তার হাতে কামড়ে দিল। মেয়ে উঃ বলে সরে এল। বাঁ হাতে ছিল কাটারি, সেটা পড়ে গেল। কিশোরী ডান হাতটা ধরে বসে পড়ল।

কাটারিটা বাঁ হাত থেকে পড়ে নীচের একটা ঝোপে গিয়ে পড়ল। ঝোপে দৌড়োদৌড়ি করছিল ছোট্ট একটা কাঠবেড়ালি। কাটারি পড়ল তার লেজের ওপরে। ছোট্ট লেজ গেল কেটে।

ব্যথায় ছটফট করে কাঠবেড়ালি তরতর করে একটা অনেক উঁচু গাছে উঠে পড়ল। তার লেজ কেটেছে, তার খুব রাগ হয়েছে। সে তো কোনোদিন কারো কোনো ক্ষতি করেনি। সে আপন মনে থাকে, খেলে, লাফিয়ে বেড়ায়। বেজায় রেগে গিয়ে সে গাছের একটা বড়ো ফলে দাঁত বসাল। বোঁটা থেকে ফল ছিঁড়ে গেল। অনেক উঁচু থেকে সেটা নীচে গিয়ে পড়ল একটা হরিণের মাথায়। সে তখন মিষ্টি রোদে গাছের তলায় ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ মাথায় কিছু পড়ায় সে চমকে উঠল। অত উঁচু থেকে পড়েছে, তার মাথায়ও লেগেছে। আবার যদি কিছু পড়ে? সে ভয় পেয়ে তিরবেগে দৌড়ে পালাল।

ঝুরো মাটির মধ্যে ছোটো ছোটো পাখির বাসা। হরিণের ছুটে চলার পথে এরকম কিছু বাসা ছিল। পায়ের চাপে বাসাগুলো ভেঙে গেল।

পাখিরা ভয় পেয়ে এদিক ওদিক উড়তে লাগল। হায়! বাসার ছানারা বোধহয় মরে গেল। ডিমগুলো বোধহয় ভেঙে গেল। বনের মধ্যে দিশেহারা হয়ে পাখিরা উড়ছে।

এক গাছের নীচে দাঁড়িয়েছিল এক হাতি। সে প্রকাণ্ড শুঁড় দিয়ে গাছের ডালপালা ভেঙে খাচ্ছে। কোনোদিকে খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা ছোট্ট পাখি তার কানের ভেতর ঢুকে গেল।

হাতি লাফিয়ে উঠল। এ কী হল তার! কানের ভেতর ফরফর করছে। সে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। কিন্তু ফরফর বন্ধ হচ্ছে না। ব্যথাও করছে। ভয় পেয়ে হাতি ছুটতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে সে এসে থামল এক চাষির ফসলের ক্ষেতে। সুন্দর ধান হয়েছে, সোনার রং ধরেছে। আর কয়েকদিন পরেই কাটতে হবে। হাতি সেই সোনালি ফসলের ক্ষেতে ঘুরপাক খেতে লাগল। তার বিশাল দেহ আর গোদা চার পায়ের চাপে ফসল নষ্ট হতে লাগল।

চাষি ছুটে এল। এ কী করছে হাতি! তার সব ফসল যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সে খাবে কী! তার পরিবারের সবাই খাবে কী?

সে হাতির সামনে গিয়ে বলল, এ কী করছ হাতি? আমার সব ফসল যে নষ্ট করে দিলে। কোনোদিন কোনো হাতি এমন কাজ করেনি।

হাতি বলল, আমিও কোনোদিন ফসলের ক্ষেত নষ্ট করিনি। কিন্তু আমি যে আর পারছি না। আমি পাগল হয়ে যাব। আমার কানের মধ্যে যে একটা ছোট্ট পাখি ঢুকে রয়েছে। আমি কী করব? চাষি, আমার কোনো দোষ নেই। আমি সহ্য করতে পারছি না।

সে কথা শুনতে পেয়ে ছোট্ট পাখি বলল, আমারও কোনো দোষ নেই। আমি কোনোকালে হাতির কানে ঢুকিনি। কিন্তু কী করব? হরিণ আমাদের বাসা ভেঙে দিল। ভয়ে উড়ে পালাতে গিয়ে না দেখে হাতির কানে ঢুকে পড়েছি। আমার কোনো দোষ নেই।

হরিণ বলল, আমারও কোনো দোষ নেই। আমি কী করব? দুষ্টু কাঠবেড়ালি উঁচু গাছ থেকে একটা ফল আমার মাথায় ফেলে দিল। খুব ব্যথা পেলাম। ভাবলাম, আবার যদি ফল ফেলে দেয়! তাই ভয় পেয়ে দৌড়তে শুরু করলাম। আমি তো নীচের দিকে তাকাইনি। পায়ের চাপে পাখির বাসা গেল ভেঙে। আমার কোনো দোষ নেই।

কাঠবেড়ালি বলল, আমার কোনো দোষ নেই। আমি ঝোপের মধ্যে খেলা করছিলাম। ওই মেয়েটার হাতের কাটারি আমার লেজে পড়ল। লেজ গেল কেটে। খুব ব্যথা পেলাম। রাগ হয়েছিল। তাই আমি উঁচু গাছের ফল ফেলে দিয়েছি। আমার কী দোষ!

কিশোরী বলল, আমার কোনো দোষ নেই। বাঁ হাতে কাটারি ধরে ডান হাত দিয়ে আমি গাছের একটা শুকনো ডাল ভাঙছিলাম। কাঠপিঁপড়ে আমার হাতে কামড়ে দিল। যন্ত্রণা হলো, বাঁ হাত থেকে কাটারি পড়ে গেল। আমি কী করব?

চাষি তখন বলল, সব নষ্টের গোড়ায় রয়েছে ওই কাঠপিঁপড়ে। এই কথা বলেই সে কাঠপিঁপড়েকে হাত দিয়ে চেপে ধরল। ধরে কিশোরীর হাতে দিল। বলল, ওকে শাস্তি দাও। বুঝিয়ে দাও ও কাজটা ভালো করেনি।

কিশোরী হাতের তালুর মধ্যে কাঠপিঁপড়েকে চেপে ধরল। হাঁটা দিল বাড়ির পথে। বাড়িতে এসে একটা সুতো দিয়ে কাঠপিঁপড়ের কোমর বাঁধল। তারপর তাকে ঝুলিয়ে রাখল একটা ছোটো গাছের সঙ্গে।

আর কোমরে সুতো বেঁধে কাঠপিঁপড়েকে ঝুলিয়ে রেখেছিল বলেই সেদিন থেকে কাঠপিঁপড়ের মাঝখানের পেটটা অমন সরু হয়ে গেল। কীসের থেকে কী যে হয়!

হাতে কলমে

শব্দার্থ : গৃহস্থ — গৃহে বাস করে যে। কিশোরী — অল্পবয়স্কা। কাটারি — দা। ক্ষতি — অপকার। তিরবেগে — তিরের মতো দ্রুত বেগে। প্রকাণ্ড — বড়ো। গোদা — মোটা এবং বড়ো। সোনালি — সোনার মতো রং যার। ঘুরপাক — গোল হয়ে ঘোরা। বেজায় — খুব। যন্ত্রণা — ব্যথা। শাস্তি — সাজা।

১. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

১.১ কিশোরী মেয়ে বনে কী করতে যায়?

১.২ কার লেজ কাটারির আঘাতে কেটে গিয়েছিল?

১.৩ কিশোরী মেয়ে কোন হাতে কাটারি ধরেছিল?

১.৪ ছোটো পাখি কার কানে ঢুকে পড়েছিল?

২. তিন-চারটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

২.১ কিশোরী মেয়েরা কীসের জন্য বনে যেত?

২.২ কাঠবেড়ালি রেগে গিয়েছিল কেন? রেগে গিয়ে সে কী করেছিল?

২.৩ হরিণ ভয় পেয়েছিল কেন? ভয় পেয়ে সে পাখির কী ক্ষতি করেছিল?

২.৪ হাতি কেন চাষির ফসলের ক্ষেত নষ্ট করে দিয়েছিল?

৩. কোন প্রাণী কী খাবার খায় তা মিলিয়ে লেখো :

কাঠবেড়ালি	কলাগাছ
পিঁপড়ে	ঘাস
হাতি	বাদাম
পাখি	চিনির দানা
হরিণ	পোকামাকড়

৪. কাদের সম্পর্কে কী বলা হয়েছে মিলিয়ে লেখো :

৪.১ কাঠপিঁপড়ে কিশোরী মেয়েটির (বাঁ হাতে / ডান হাতে) কামড়ে দিয়েছিল।

৪.২ হাতি (ধানের ক্ষেত / আখের ক্ষেত) নষ্ট করে দিয়েছিল।

৪.৩ হরিণের (পায়ের চাপে / শিঙের চাপে) পাখির বাসা ভেঙে গিয়েছিল।

৪.৪ কিশোরী মেয়েটি কাঠপিঁপড়ের (কোমরে / পায়ে) সুতো বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিল।

৫. বাঁদিকের সঙ্গে ডান দিকের তালিকা মেলাও :

পাখির	শুঁড়
গাছের	তালু
ফসলের	বাসা
হাতির	ডাল
হাতের	ক্ষেত

৬. নীচে গল্পের ঘটনাগুলো এলোমেলো করে দেওয়া হলো। তোমরা ঘটনা অনুযায়ী পরপর সাজিয়ে লেখো:

৬.১ কাঠবেড়ালি রেগে উঁচু গাছের ফল হরিণের মাথায় ফেলে দিল।

৬.২ কাটারির আঘাতে কাঠবেড়ালির লেজ কেটে গেল।

৬.৩ হরিণের পায়ের চাপে পাখির বাসা ভেঙে গেল।

৬.৪ ছোটো পাখি ভয় পেয়ে হাতির কানে ঢুকে পড়ল।

৬.৫ কাঠপিঁপড়ের কামড় খেয়ে কিশোরী মেয়ের হাত থেকে কাটারি পড়ে গেল।

৬.৬ হাতির পায়ের চাপে ফসলের ক্ষেত নষ্ট হয়ে গেল।

৬.৬ হরিণ ভয় পেয়ে ছুটে পালাল।

৬.৭ হাতি কানের ব্যথায় পাগল হয়ে চাষির ফসলের ক্ষেতে ঢুকে পড়ল।

৭. নীচে যে শব্দগুলি দেওয়া আছে, সেগুলি ব্যক্তি, প্রাণী, বস্তু বা কাজের নাম, নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ, মনের ভাব বা কাজকেই বোঝাচ্ছে। তোমরা সেগুলো আলাদা করে, নীচের তালিকাটি সম্পূর্ণ করো :

কাঠপিঁপড়ে, রাগ, কাটারি, সে সব, দৌড়, হাতি, লাফিয়ে উঠল, ভয়, সে, ঘুমোচ্ছিল, তার, ভেঙে দিল, ঝুলিয়ে রাখল।

ব্যক্তি / প্রাণী / বস্তুর নাম	নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত শব্দ	মনের ভাব	কাজের নাম	কোনো কাজ

৮. নীচে যে শব্দগুলি আছে তাদের অন্য অর্থ পাশের বাক্সের মধ্যে রয়েছে। সেগুলি খুঁজে নিয়ে শব্দের পাশে পাশে লেখো :

মেয়ে — কাটারি

পাখি — ব্যথা

গ্রাম — চাষি

ডাল — বন

গাঁ, অরণ্য, পক্ষী, শাখা, দা, যন্ত্রণা, কৃষক, কন্যা

৯. নীচে যে প্রাণীদের নাম দেওয়া আছে তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে দুটি করে বাক্য লেখো :

হরিণ, কাঠবেড়ালি, কাঠপিঁপড়ে, হাতি, পাখি।

১০. নীচের ছকে ঠিক মতো √ বা × চিহ্ন দাও :

বৈশিষ্ট্য	হাতি	পাখি	হরিণ	কাঠবেড়ালি
চারটি পা আছে	√	×	√	√
উড়তে পারে				
লেজ আছে				
ঘাস খায়				
পালক আছে				
শিং আছে				

১১. নীচের ছবিগুলির তলায় গল্প থেকে ঠিক বাক্য খুঁজে নিয়ে লিখে কাহিনিটি সম্পূর্ণ করো :

১১.১ ____________________

১১.২ ____________________

১১.৩ ____________________

১১.৪ ____________________
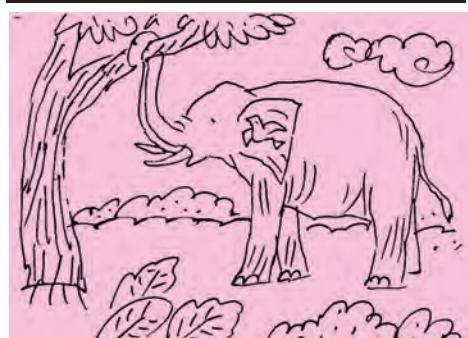
১১.৫ ____________________

১১.৬ ____________________

১১.৭ ____________________

অঙ্কন : সুব্রত মাজী

আগমনী

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বর্ষা করে যাব, যাব,
শীত এখনও দূর,
এরই মধ্যে মিঠে কিন্তু
হয়েছে রোদ্দুর!

মেঘগুলো সব দূর আকাশে
পারছে না ঠিক বুঝতে,
ঝরবে, নাকি যাবে উড়ে
অন্য কোথাও খুঁজতে!

থেকে থেকে তাই কি শুনি
বুক-কাঁপানো ডাক?
হাঁকটা যতই হোক না জবর
মধ্যে ফাঁকির ফাঁক!

আকাশ বাতাস আনমনা আজ
শুনে এ কোন ধ্বনি,
চিরনতুন হয়েও অচিন
এ কার আগমনী।

হাতে কলমে

১. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

১.১ শরৎ ঋতুর আগে কোন ঋতু আসে?

১.২ শরৎকালে বাঙালিদের কী কী উৎসব হয়?

২. **দু-তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ শরৎকালে প্রকৃতির রূপ কেমন থাকে?

২.২ শরৎকালের মেঘ দেখতে কেমন হয়?

২.৩ শরৎকাল প্রসঙ্গে মনে পড়ে এমন দুটো সাদা জিনিসের নাম করো (একটা থাকে আকাশে, আর একটা মাঠে)।

৩. **বুঝতে-খুঁজতে, আকাশ-বাতাস— এই জোড়া শব্দগুলোর মধ্যে যেমন ছন্দের মিল আছে, তেমনভাবে ছন্দ মিলিয়ে নীচের তালিকাটি সাজাও :**

রোদ্দুর	ডাক
প্রাচীন	ভরসা
ধ্বনি	সমুদ্দুর
বর্ষা	অচিন
হাঁক	আগমনী

৪. **যে শব্দটি বেমানান তাতে গোল দাগ দাও :**

৪.১ শীত, বসন্ত, হেমন্ত, বৈশাখ, গ্রীষ্ম

৪.২ মেঘ, আগুন, বৃষ্টি, জল, বজ্রপাত

৪.৩ দুর্গা, কাশ, বরফ, শরৎ, নীল আকাশ

৫. **পাশের শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:**

সাদা, ঢাকের, আশ্বিন, নীল, কাশ, আনন্দে, তুলোয়, কালো, দুর্গা পুজো, ইদ, পেঁজা

শরৎ আমাদের সকলেরই খুব প্রিয় ঋতু। ভাদ্র ___ এই দুই মাস শরৎকাল। এই সময় আকাশ থেকে বর্ষার ___ মেঘ সরে যায় এবং ___ আকাশে ছড়িয়ে থাকে ___ রঙের ___ তুলোর মতো মেঘ। মাঠ ভরে থাকে ___ ফুলে। বাতাসে ভাসে ___ শব্দ। বাঙালির প্রাণের উৎসব ___ এবং ___ এই শরৎকালেই হয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মেতে ওঠে উৎসবের ___ ।

৬. **নীচের সূত্রগুলি ব্যবহার করে শরৎকাল সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লেখো:**

(নীল আকাশ—সাদা মেঘের ভেলা—কাশফুল—উৎসব—বেড়ানো—ছুটি—মজা)।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪—১৯৮৮) : রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় কবি, গল্পকার । ছোটোদের জন্য সৃষ্টি করেছেন ‘ঘনাদা’। এছাড়া বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনি, রোমাঞ্চকর কাহিনি, গোয়েন্দা গল্প এইসব ধরনের রচনাতেই তিনি পারদর্শী ছিলেন। ১৯২৬ সালে ‘কল্লোল’ পত্রিকার কবি হিসাবে তাঁর প্রথম খ্যাতি। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ‘সাগর থেকে ফেরা’, ‘হরিণ-চিতা-চিল’ ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি প্রচুর সার্থক ছোটোগল্প লিখেছেন।

উড়ুক্কু ভূত

শৈলেন ঘোষ

সেদিন দুপুরবেলা ঝড় উঠেছিল—সাঁই-সাঁই-পাঁই-পাঁই করে। আর অমনি ঝড়ের ঝাপটায় বাগানে একটা ভূত ঢুকে পড়েছে। উরি বাবা—কী চেহারা ভূতটার। ড্যাবরা-ড্যাবরা চোখ, থ্যাবড়া-থ্যাবড়া নাক আর ফিনফিনে ফুরফুর। হাত নেই পা নেই, ধড়কাটা নড়া-ছটকানো ভূত। দাঁত ছরকুট্টে বাগানে ঢুকে হাওয়ায় ছুটছে।

প্রথম ভূতটাকে দেখতে পেয়েছিল কাক-ছানাটা। ঝড়ের সময় নিমগাছের বাসায় সে ঘাপটি মেরে বসেছিল। এমন সময় ভূতটা কোত্থেকে এসে একেবারে ওর ঘাড়ে। কাক বাছাধন ক্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ করে কেঁদে ওঠার আগেই ভূতটা তার ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিয়ে ফুড়ুত করে উড়ে একেবারে পেয়ারাগাছের ফোকরে। পেয়ারাগাছে একটা কাঠবিড়ালি, ডাল জড়িয়ে ঝড়ের হাওয়ায় দোল খাচ্ছিল। ধড়কাটা ভূতটা যেই না কাঠবিড়ালিটার মুখের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, অমনি কাঠবিড়ালিটা 'ও মাগো জলজ্যান্ত ভূত গো'—বলেই ডাল ছিটকে একেবারে অজ্ঞান হয়ে মাটির ওপর লটকে পড়ল।

ঝড়ের তেজ বাড়ল, আবার ভূত ছুটল। পেয়ারাগাছ থেকে আমড়াগাছে। আমড়াগাছে মামদোবাজি লাগিয়ে দিলে। দিনের আলোয় হুতুমমুখো পেঁচাটা বাঁ-চোখের পর্দা ফেলে, ডান চোখটা খুলে ঝড়ের গুলতানবাজি দেখছিল। ফস করে ভূতটা তার মাথায় একটা টোক্কা মারতেই, 'কে র‍্যা?' বলে গম্ভীর চালে ধমকে উঠেছে। ধমকে উঠে যেই না বাঁ-চোখ খুলে ডান চোখ বুজেছে, আবার ডান চোখ বুজিয়ে বাঁ চোখ খুলেছে, ব্যাস অমনি সোনার-চাঁদের পিলে শুকিয়ে পাঁপড়ভাজা হয়ে গেছে। দু চোখ আর একসঙ্গে চাইতে হলো না। গলায় ঢোঁক গিলতে গিলতে কঁক করে দম আটকে বেচারা স্বর্গে গেলেন।

আবার ছুট। ঝড় ছোটে, ঝড়ের সঙ্গে ভূত ছোটে, ভূতকে দেখে ইঁদুর ছোটে, ইঁদুরকে দেখে ব্যাং ছোটে, ব্যাংকে দেখে ফড়িং ছোটে, ফড়িংকে দেখে চড়াই ছোটে, শালিক ছোটে। ছুটতে ছুটতে ভূতটা গিয়ে পড়ল বেগুন গাছের কাঁটায়। বেগুন গাছের কচিপাতায় দোল খেতে খেতে একটা গুটিপোকা কুট-কুট করে পাতা খাচ্ছিল। ভূতটাকে দেখে গ্রাহ্যি নেই! খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। আপন মনে খাচ্ছে। ভূতটা কচিপাতার ওপর উড়ে বসল। গুটিপোকাটা অমনি সঙ্গে সঙ্গে এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে বসল। মনে মনে গুটিপোকাটা বললে, 'ছাই, ভূত না আর কিছু।'

ওমা! অমনি ঝড় গেল থেমে। ঝমঝম করে বৃষ্টি এল। আর সেই সৃষ্টিছাড়া ভূতটা জলের তোড়ে ব্যাস! ফ্যাঁস! ভূতের চেহারাটা জলের তোড়ে ভিজে—ফাঁক। ভূতের চোখ দিয়ে, নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে দরদর করে বেরিয়ে এল জলে গোলা রং। রং ফুরোলে, মনে হলো কাকুর খবরের কাগজের যেন একটা ছেঁড়া পাতা। সেই ছেঁড়া পাতায় কে যেন ভূতের ছবি এঁকেছে! খবরের কাগজ মার্কা আচ্ছা গোলমেলে ভূত তো এটা!

শৈলেন ঘোষ (জন্ম ১৯২৮) : কৈশোরে ছোটোদের পত্রিকা 'মাস পয়লা'য় প্রথম কবিতা লেখা। 'অরুণ বরুণ কিরণমালা' শিশু নাটকটি সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। তাঁর রচিত উপন্যাস- 'মিতুল নামে পুতুলটি' জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত। অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'আমার নাম টায়রা', 'গল্পের মিনারে পাখি', 'ভূতের নাম আক্কুশ', 'টুই টুই' ইত্যাদি। এছাড়াও ছোটোদের জন্য অজস্র গল্প, ছড়া, নাটক রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন- 'হাসি ঝলমল মজা', 'স্বপ্ন দেখি রূপকথায়', 'ভালোবাসি পশুপাখি', 'গল্পের রং রকম রকম'।

শব্দার্থ : ধড় — দেহ। ফিনফিনে — পাতলা। দাঁত ছরকুট্টে — দাঁত বের করে। কোত্থেকে — কোথা থেকে। অজ্ঞান — অচেতন। গ্রাহ্যি — গ্রাহ্য, সমীহ।

হাতে কলমে

১. **এক কথায় উত্তর দাও :**

১.১ ভূতকে প্রথমে কে দেখতে পেয়েছিল?

১.২ কাকের ছানাটা কোন গাছের ডালে বসেছিল?

১.৩ আমড়াগাছে কে বসেছিল?

১.৪ কে কুট-কুট করে বেগুন গাছের কচি পাতা খাচ্ছিল?

২. **তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :**

২.১ ভূতের চেহারা কেমন ছিল?

২.২ ভূতকে দেখে হুতুমমুখো পেঁচার অবস্থা কেমন হয়েছিল?

২.৩ গুটিপোকা ভূতকে দেখে কী করেছিল আর মনে মনেই বা কী বলেছিল?

২.৪ বৃষ্টি নামার পর ভূতের অবস্থা কেমন হয়েছিল?

২. **কে, কোন গাছে বসেছিল লেখো :**

২.১ গুটিপোকা ———— (লঙ্কা গাছ / বেগুন গাছ / জাম গাছ)

২.২ কাঠবেড়ালি ——— (পেয়ারা গাছ / লিচু গাছ / কলা গাছ)

২.৩ হুতুমমুখো পেঁচা——— (আমড়া গাছ / আম গাছ / কাঁঠাল গাছ)

২.৪ কাগের ছানা ——— (শিম গাছ / নিম গাছ / বেল গাছ)

৩. **কে, কোন কথাটা বলেছে মিলিয়ে লেখো :**

'ও মাগো জলজ্যান্ত ভূত গো'	প্যাঁচা
'কে র‍্যা?'	কাগছানা
ক্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ (কান্না)	গুটিপোকা
'ছাই, ভূত না আর কিছু'	কাঠবেড়ালি

৪. **শূন্যস্থান পূরণ করো : (পাশের ঝুড়িতে যে শব্দগুলো আছে তার সাহায্য নাও)।**

৪.১ হুতুমমুখো পেঁচাটা বাঁ চোখের ___ ফেলে ডান চোখ খুলে রেখেছিল ।

৪.২ কাঠবেড়ালি পেয়ারা গাছের ডাল জড়িয়ে ___ হাওয়ায় দোল খাচ্ছিল।

৪.৩ ভূতটা আসলে কাকুর ___ কাগজের ছেঁড়া পাতায় আঁকা ছিল।

৪.৪ ভূতটা ___ গাছের কাঁটায় আটকে গেল।

বেগুন, খবরের, ঝড়ের, পর্দা

৫ কাকুর খবরের কাগজের ছেঁড়া পাতায় আঁকা ভূতের ছবিটাই ঝড়ের ঝাপটায় উড়ে গিয়ে সবাইকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। তেমনিভাবে আর কী কী দেখে কীভাবে মানুষ অকারণে ভয় পেতে পারে, এ নিয়ে একটা ছোট্ট গল্প লেখো।

‘কীসের থেকে কী যে হয়’ আর ‘উড়ুক্কু ভূত’ মজার গল্প, ‘আগমনী’ আনন্দের কবিতা, উৎসবের কবিতা। এমনই আরেকটি ছোটো কবিতা তোমাদের জন্য রইল, পাশাপাশি পড়ার জন্য। কবিতায় রমেশের মতো তোমরাও কি মাঝে মাঝে একই কাজ করো?

মা ও ছেলে

রসময় লাহা

‘কুলুঙ্গিতে তিন জোড়া রেখেছি সন্দেশ,
এরই মধ্যে এক জোড়া কী হলো, রমেশ?’
‘এত অন্ধকার, মা গো, ওই কুলুঙ্গিতে
আরো যে দু জোড়া আছে পাইনি দেখিতে।’

রসময় লাহা (১৮৬৯-১৯২৯): প্রকাশিত কবিতার বই ‘পুষ্পাঞ্জলি’, ‘ছাইভস্ম’, ‘আরাম, আমোদ’, ‘পরিহাস’। ‘পুষ্পাঞ্জলি’ ছাড়া অন্যান্য কবিতার বইগুলো বেশ মজার।

কে ছিলেন ইশপ

ইশপের নাম শোনেনি এমন মানুষ মনে হয় গোটা পৃথিবীতেই খুব বেশি নেই। তাঁর কোনো না কোনো গল্প তোমরাও নিশ্চয়ই এর মধ্যেই পড়ে বা শুনে ফেলেছ। সেই যে একটা শেয়াল কিছুতেই আঙুরগুচ্ছের নাগাল না পেয়ে শেষে 'আঙুরফল টক' বলে চলে গিয়েছিল। কিংবা ধরো, খরগোশ আর কচ্ছপের সেই গল্পটা, অহংকারী খরগোশ কচ্ছপের জেদ আর নিষ্ঠার কাছে দৌড় প্রতিযোগিতায় কেমন হেরে গিয়েছিল। অথবা, সেই যে একটা রাখাল ছেলে, মিছিমিছি 'বাঘ বাঘ' বলে চেঁচিয়ে যে লোক জড়ো করত, তারপর সত্যিই যখন একদিন তার ভেড়ার পালে বাঘ এসে পড়ল, তখন সেই ছেলেটার চিৎকার শুনেও কেউ বাঁচাতে এল না—এসব গল্প যে ইশপেরই, তা তোমরা জানো।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এমন চমৎকার সমস্ত গল্প যাঁর রচনা, কে ছিলেন সেই মানুষটি? প্রাচীন গ্রিস দেশের এই মানুষটি ছিলেন একজন ক্রীতদাস। তাঁর চেহারা এমন কিছু আহামরি সুন্দর ছিল না, তা নিয়ে তাঁকে অনেক উপহাসও শুনতে হতো, তবে মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন অতি জ্ঞানী। তাঁর আশপাশের সমস্ত লোকজনের আচার-ব্যবহার খুব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে লক্ষ করতেন তিনি, তারপর তাদেরই দোষ আর গুণ নিয়ে বানাতেন গল্প। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই এমন অনেক দোষ বা গুণ দেখা যায়, যা দেখে বিভিন্ন পশু-পাখির কথা মনে আসে। ইশপের এই সব গল্পের চরিত্রগুলিও তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ নয়, পশুপাখি। অবশ্য পশু-পক্ষীর কাহিনির ছদ্মবেশে মানুষের কথাই লিখেছেন ইশপ।

ইশপের প্রভু, রাজা ক্রোসাস একবার কিছু টাকা দিয়ে তাঁকে ডেলফিতে পাঠান। এই ডেলফি জায়গাটির পুরোহিতরা ছিল ভবিষ্যৎবাণীর জন্য বিখ্যাত কিন্তু তারা ছিল বড়ো লোভী। তারা যত টাকা পায়, ততই চায় আরো আরো টাকা। তাদের এই অর্থলোভ দেখে ইশপ বাঁধলেন একটি গল্প, আর সেই গল্পটি তিনি তাদের শুনিয়েও দিলেন। সেই যে একটা লোভী লোক, যার একটা সোনার ডিম-পাড়া হাঁস ছিল। সেই হাঁস রোজ একটা করে সোনার ডিম পাড়ত। লোকটা ভেবেছিল, যে হাঁস সোনার ডিম পাড়ে, তার পেটের মধ্যে নিশ্চয় অজস্র সোনার ডিম রয়েছে। সোনার লোভে একদিন লোভী লোকটা হাঁসের পেটটাই ফেলল কেটে। তাতে ফল হলো এই যে, রোজ তো সে একটা করে সোনার ডিম পেত, তাও আর তার পাওয়া হলো না। এইরকম অনেক-অনেক গল্প বানিয়েছিলেন ইশপ। সবই নীতিগল্প। অর্থাৎ সেগুলি পড়ে যে শুধু গল্পের মজা পাওয়া যায় তা নয়, সেই সঙ্গে পাওয়া যায় খুব ভালো ভালো সব উপদেশ। দয়া, মায়া, ভালোবাসা, সততা, কৃতজ্ঞতা, পরোপকার, শ্রদ্ধা, ভক্তি—এইসব সদ্‌গুণ যে আমাদের জীবনে কত জরুরি, তা আমাদের মনে করিয়ে দেন ইশপ।

ইশপের গল্পের অনুবাদ হয়েছে পৃথিবীর নানা দেশে, প্রতি যুগের নিজস্ব ভাষায়। তাই সরাসরি অনুবাদ না করে অনেকেই গল্পগুলিকে নিজেদের দেশের আর সময়ের উপযোগী করে একটু বদলেও নিয়েছেন। কিন্তু গল্পগুলির মূল্য তাতে একটুও কমেনি। মানবজাতির সবচেয়ে বড়ো শিক্ষকদের একজন এই মানুষটি— ইশপ।।

হাতে কলমে

১. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

১.১ শেয়াল কিছুতেই কীসের নাগাল পায়নি?

১.২ শেয়াল শেষে কী বলে চলে গিয়েছিল?

১.৩ খরগোশ কেমন ছিল?

১.৪ খরগোশ কার কাছে দৌড় প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়েছিল?

১.৫ খরগোশ কেন হেরে গিয়েছিল?

১.৬ রাখাল ছেলে কী করত?

১.৭ ইশপ কোন দেশের মানুষ ছিলেন?

১.৮ ইশপ কাদের নিয়ে গল্প বানাতেন?

১.৯ ইশপের প্রভু কে ছিলেন?

১.১০ তিনি ইশপকে কোথায় পাঠিয়েছিলেন?

১.১১ সেই জায়গাটি কেন বিখ্যাত ছিল?

১.১২ সেখানকার মানুষ কেমন ছিল?

১.১৩ তাদের আচরণ দেখে ইশপ কোন গল্প বাঁধলেন?

১.১৪ নীতিগল্প কাকে বলে?

১.১৫ আমাদের জীবনে কোন গুণগুলি জরুরি?

১.১৬ অনুবাদ বা তরজমা কাকে বলে?

১.১৭ ইশপের গল্প বিভিন্ন দেশে কেন জনপ্রিয়?

১.১৮ ইশপকে কেন ‘মানবজাতির সবচেয়ে বড়ো শিক্ষকদের একজন’ বলা হয়েছে?

শব্দার্থ : আঙুরগুচ্ছ — আঙুরের থোকা। নাগাল — ছোঁয়া। অহংকারী — দাম্ভিক, গর্বিত। জেদ — গোঁ, নাছোড়বান্দা ভাব। নিষ্ঠা — মনোযোগ, অনুরক্তি। ভেড়ার পাল — ভেড়ার দল। ক্রীতদাস — কেনা গোলাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে — খুব মনোযোগ দিয়ে নজর করে। ছদ্মবেশ — আত্মগোপনের জন্য নেওয়া বেশ বা পোশাক। পুরোহিত — দেবতার পুজো করে যে। ভবিষ্যৎবাণী — ভবিষ্যতের কথা আগে বলে দেওয়া। নীতিগল্প — যে গল্প থেকে নীতিশিক্ষা পাওয়া যায়। উপদেশ — শিক্ষা, পরামর্শ, কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ। সততা — সাধুতা। কৃতজ্ঞতা — উপকারীর উপকার স্মরণ রাখা। সদ্‌গুণ — ভালো গুণ। অনুবাদ — তরজমা, অন্য ভাষায় পরিবর্তন।

২. **‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও :**

ক	খ
শেয়াল	ভবিষ্যৎবাণী
রাখাল ছেলে	সোনার ডিম
ডেলফি	বাঘ
খরগোশ	আঙুরগুচ্ছ
হাঁস	দৌড় প্রতিযোগিতা

৩. **ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে নীচের শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৩.১ ইশপ ছিলেন একজন ______ (রাজা/ পুরোহিত/ক্রীতদাস)।

৩.২ ইশপের প্রভু ছিলেন রাজা ______ (ক্রোসাস/অলিম্পাস/জুলিয়াস)।

৩.৩ ইশপ ছিলেন ______ (চিন/গ্রিস/মিশর) দেশের লোক।

৩.৪ ইশপের প্রভু ইশপকে ______ (এথেন্স/স্পার্টা/ডেলফি) নগরে পাঠিয়েছিলেন।

৩.৫ ডেলফি শহরটি বিখ্যাত ছিল ______ (মসলিন কাপড়/ভবিষ্যৎবাণী/যুদ্ধবিগ্রহ)-এর জন্য।

৪. **নীচের শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দ বেছে ঠিক জায়গায় বসাও :**

অনুবাদ, উপহাস, নিষ্ঠা, নীতিগল্প, সোনার ডিম

৪.১ কচ্ছপের ছিল জেদ আর ______।

৪.২ একটা হাঁস ______ পাড়ত।

৪.৩ চেহারা নিয়ে ইশপকে ______ শুনতে হতো।

৪.৪ ইশপের রচনাগুলি ______।

৪.৫ ইশপের গল্পের ______ হয়েছে পৃথিবীর নানা দেশে নানা ভাষায়।

৫. **এই গদ্যে বলা নেই, তোমার জানা ইশপের এমন কোনো গল্প নিজের ভাষায় লেখো।**

৬. **ইশপের মতোই আমাদের দেশে ছিলেন বিষ্ণুশর্মা। তাঁর লেখা ‘পঞ্চতন্ত্র’ গোটা পৃথিবীতেই বিখ্যাত এবং সমাদৃত। ‘পঞ্চতন্ত্র’ থেকে কোনো গল্প জানা থাকলে সেটি শ্রেণিকক্ষে সবাইকে শোনাও। আর যদি জানা না থাকে, তবে শিক্ষিকা / শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নাও।**

৫. ইশপের অধিকাংশ গল্পের চরিত্ররাই বিভিন্ন জীবজন্তু, নীচের ছবিটি থেকে কটি প্রাণীর ছবি আর কটি অন্যান্য জিনিসের ছবি খুঁজে পাচ্ছ বলো। খুঁজে পাওয়ার পর পছন্দমতো আলাদা আলাদা রং দাও :
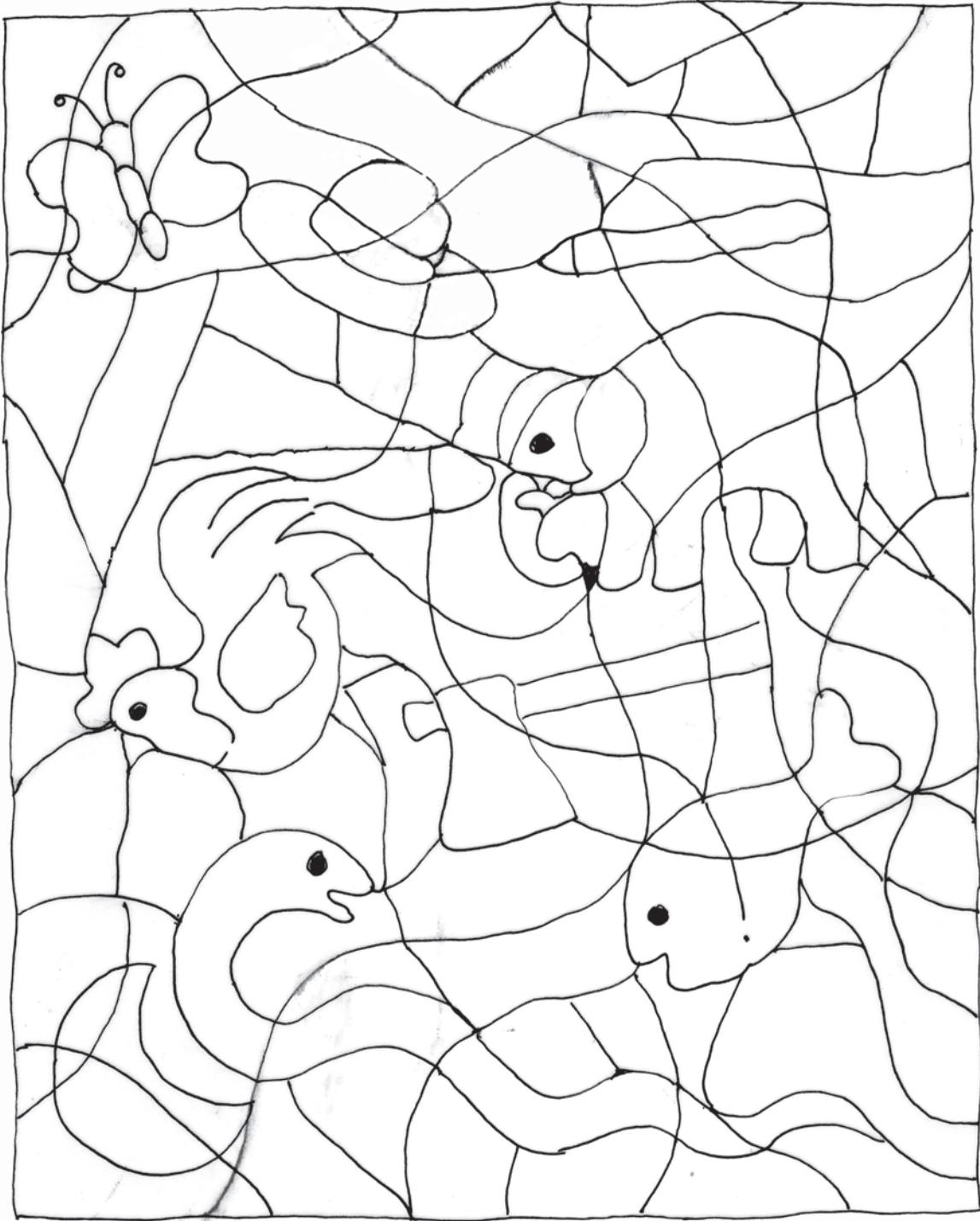
পানতাবুড়ি

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

গাঁয়েতে এক বুড়ি ছিল। তার মতো এমন গরিব কেউ কখনো দেখেনি। ভিক্ষা করে সে যে-কটি চাল পেত, ভাত রেঁধে চারটি রাতের বেলা খেত, বাকিগুলি পরদিন সকালের জন্য জল দিয়ে রাখত। সব দিন পানতাভাত খেত বলে, তার নাম ছিল পানতাবুড়ি।

একবার সেই গাঁয়ে এক চোর এসে উপস্থিত। বুড়ির পানতার সন্ধান পেয়ে সে রোজ রোজ তা খেতে লাগল। চোরের জ্বালায় বেচারি তো অস্থির।

একদিন বুড়ি রাজার কাছে নালিশ করতে চলল। যেতে যেতে পথে দেখল, একটা বেল পড়ে আছে। বেল জিজ্ঞাসা করল, বুড়ি, বুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?

বুড়ি। চোরে পানতা খেয়েছে, তাই রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি।

বেল। ফিরে যাবার সময় আমায় নিয়ে যেয়ো।

বুড়ি। আচ্ছা।

কিছু দূরে গিয়ে বুড়ি দেখল, একটা শিঙি মাছ।

মাছ বলল, বুড়ি, বুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?

বুড়ি। চোরে পানতা খেয়েছে, রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি।
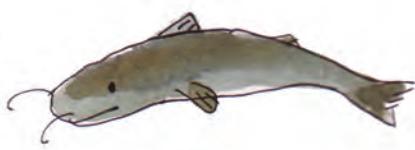
মাছ। ফিরে যাবার সময় আমায় নিয়ে যেয়ো।

বুড়ি। আচ্ছা থাকো।

আর কিছু দূর গিয়ে বুড়ি একটি সূচ দেখতে পেল। সূচ বলল, বুড়ি, বুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?

বুড়ি। চোরে পানতা খেয়েছে, রাজার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছি।

সূচ। ফিরে যাবার সময় আমায় নিয়ে যেয়ো।

বুড়ি। আচ্ছা, বেশ!

আরও কিছু দূর গিয়ে বুড়ি দেখল, একখানা ছুরি পড়ে আছে। ছুরি জিজ্ঞাসা করল, বুড়ি, বুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?

এতক্ষণ বুড়ি বেশ সহজভাবেই জবাব দিচ্ছিল, ক্রমে তার মাথা গরম হয়ে উঠল। ছুরির কথার উত্তরে সে বিরক্ত হয়ে বলল, যেথায় যাই না, তোর তাতে কী?

ছুরি। রাগ করো কেন? একটা কথা শোনো—ফিরে যাবার সময় আমায় নিয়ে যেয়ো।

বুড়ি। আচ্ছা আচ্ছা, সে তখন হবে।

শেষে রাজবাড়ির কাছাকাছি গিয়ে বুড়ি দেখল, পথের ধারে একটা কুমির পড়ে আছে। কুমির বলল, বুড়ি, বুড়ি, কোথায় যাচ্ছ?

বুড়ির মেজাজ তখন আরও গরম। বলল, তোর কী? যেথায় খুশি যাচ্ছি! যমের বাড়ি যাচ্ছি, তুই যাবি?

কুমির। বাপরে বাপ—একেবারে যে আগুন! বলছি কী, ফিরে যাবার সময় আমায় নিয়ে যেয়ো।

বুড়ি। বেশ, দেখা যাবে।

এর পর বুড়ি যখন রাজবাড়িতে পৌঁছল, তখন বেলা প্রায় শেষ হয়েছে। সেদিন রাজা গিয়েছিলেন শিকারে। কাজেই, বুড়ির আর নালিশ করা হলো না। ফিরবার পথে সে সেই কুমির, ছুরি, সূচ, শিঙি মাছ ও বেল নিয়ে এল।

শিঙি মাছ বলল, আমায় পানতার হাঁড়িতে রাখো।

বেল। আমায় আগুনের ভিতর রাখো।

সূচ। আমায় দেয়ালে পুঁতে রাখো।

ছুরি। আমায় উঠানের ঘাসে গুঁজে রাখো।

কুমির। আমায় ঘাটে বেঁধে রাখো।

যার যেমন ইচ্ছা, তাকে সেইভাবে রেখে বুড়ি রাত্রে ঘুমিয়েছে, এমন সময় চোর এসে উপস্থিত। সে যেই পানতার হাঁড়িতে হাত দিয়েছে, অমনি শিঙি মাছের কাঁটার এক খোঁচা! আগুন-তাপ দেবার জন্য যেই উনানের ধারে গেছে, অমনি বেল ফেটে চোখ অন্ধ। হাতড়াতে হাতড়াতে দরজার ধারে এসেছে, অমনি কাদায় পা পিছলে দড়াম! আহা, বেচারার আর শাস্তির শেষ নেই। দেয়াল ধরে উঠতে যাবে, অমনি সূচ বিঁধে রক্তারক্তি! উঠান দিয়ে পালাবে, অমনি ছুরিতে পা কেটে খানখান! ঘাটে নেমে হাত-পা ধোবে, অমনি একেবারে কুমিরের মুখে।

কুমির চিৎকার করে উঠল—

ও বুড়ি, তোর চোর ধরেছি।
ও বুড়ি, তোর চোর ধরেছি।
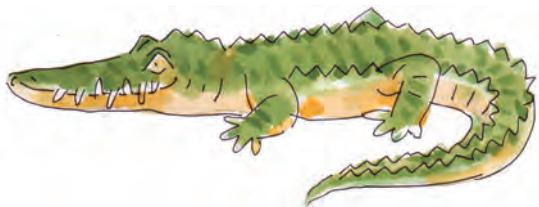
কুমিরের চিৎকার—বাপ রে সে কী ভয়ানক! বাঘের ডাক লাগে কোথায়! বুড়ি তো ধড়ফড় করে উঠে বসল। তারপর লোকজন ডেকে, চোরকে বেঁধে রাজার কাছে হাজির করল। রাজা তাকে এমন শাস্তি দিলেন যে, সে আর কী বলব!

১. এক কথায় উত্তর দাও :

১.১ পানতাবুড়ির নাম অমন হলো কেন?

১.২ পানতাবুড়ির দিন চলত কেমন করে?

১.৩ পানতাবুড়ি কার জ্বালায় অস্থির?

১.৪ অস্থির হয়ে পানতাবুড়ি কী করতে চলল?

১.৫ রাস্তায় প্রথমে তার সঙ্গে কার দেখা হলো?

১.৬ কিছুটা দূরে গিয়ে পানতাবুড়ির সঙ্গে কার দেখা হলো?

১.৭ সূচ বুড়িকে কী বলেছিল?

১.৮ ক্রমে বুড়ির মাথা গরম হয়ে উঠল কেন?

১.৯ বিরক্ত হয়ে বুড়ি কাকে কী বলেছিল?

১.১০ রাজবাড়ির কাছে গিয়ে বুড়ি কী দেখল?

১.১১ বুড়ি রাজবাড়িতে কখন পৌঁছল?

১.১২ বুড়ির আর নালিশ করা হলো না কেন?

১.১৩ ফিরবার পথে সে কী কী নিয়ে এল?

১.১৪ শিঙি মাছ কী বলল?

১.১৫ পানতা শব্দটির অর্থ লেখো।

১.১৬ বেল কী বলল?

১.১৭ সূচ কে কোথায় রাখা হলো?

১.১৮ ছুরি কোথায় গোঁজা ছিল?

১.১৯ কুমির কোথায় ছিল?

১.২০ কাকে বেঁধে রাজার কাছে হাজির করানো হলো?
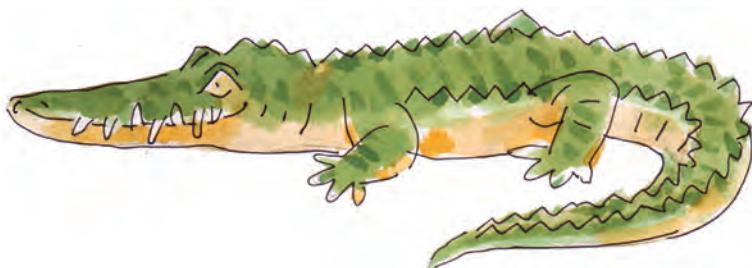
শব্দার্থ : গাঁ — গ্রাম। ভিক্ষা — চেয়ে চিন্তে দিন কাটানো। পানতাভাত — জল দেওয়া ভাত। শিঙি মাছ — একধরনের জিওল মাছ। সুচ — সেলাইয়ের উপকরণ। ঘাট — পুকুরে নামার সিঁড়ি। যমের বাড়ি — মৃত্যুপুরী। মেজাজ — মনের অবস্থা।

২. ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১ একবার গাঁয়ে এক ______ (চোর / ডাকাত / সন্ন্যাসী) এসে হাজির হলো।

২.২ বুড়ি বলল চোর তার ______ (পানতা / পায়েস / পিঠে) খেয়েছে।

২.৩ কিছু দূর গিয়ে বুড়ি দেখল, একটা ______ (শিঙি মাছ / রুই মাছ / কাতলা মাছ)।

২.৪ সেদিন রাজা গিয়েছিল ______ (শিকারে / বেড়াতে / যুদ্ধে)।

২.৫ ______ (কুমির / সুচ/ শিঙি মাছ) চিৎকার করে বলল, ও বুড়ি তোর চোর ধরেছি।

৩. ‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও :

ক	খ
বুড়ি	গরম
শিঙি মাছ	উনান
বেল	ঘাট
মেজাজ	পানতাভাত
কুমির	পানতার হাঁড়ি

৪. নীচের শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করো :

৪.১ তারপর লোকজন ______কে বেঁধে রাজার কাছে হাজির করল।

৪.২ ______ বলল, আমাকে উঠোনের ঘাসে গুঁজে রাখো।

৪.৩ অমনি ______ বিঁধে রক্তারক্তি।

৪.৪ বুড়ির মেজাজ তখনও ______।

৪.৫ বুড়ি রাজার বাড়িতে ______ করতে চলল।

চোর , ছুরি, সুচ, গরম, নালিশ

যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬ - ১৯৩৭) : বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শিশুসাহিত্যিক। ‘হাসিখুশি’ রচনার জন্য তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। ‘বিকাশ’ ও ‘দীপ্তি’ নামে দুটি কাব্য লিখেছেন। তাঁর রচিত অন্যান্য বই - ‘ছবি ও গল্প’, ‘খেলার সাথী’, ‘বন্দেমাতরম’, ‘বনে জঙ্গলে’, ‘ছোটদের চিড়িয়াখানা’, ‘গল্পসঞ্চয়’ প্রভৃতি।

ঘুমিয়ো নাকো আর

বিমল চন্দ্র ঘোষ

রূপকথাটি জড়িয়ে বুকে খোকন ঘুমে মগ্ন
স্বপ্ন! স্বপ্ন! স্বপ্ন!
আসছে যাচ্ছে কল্পলোকের হরেক রকম মানুষ
কেউ মাটিতে হেঁটেই চলে কেউ বা চড়ে ফানুস,
কারুর চোখে চশমা আঁটা, কারুর মুখে দাড়ি,
হাসলে কারও বেরিয়ে পড়ে ফোকলা দাঁতের মাড়ি!
একটু পরেই সব চুপচাপ কেউ কোত্থাও নেই,
স্বপ্নবুড়ি চরকা থামায় হারায় সুতোর খেই;
চাঁদের আলোয় দিগন্তহীন তেপান্তরের মাঠ,
জনমানুষের নেইকো দেখা বিষণ্ণ পথঘাট।
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিঁঝির ঝিঁঝির ঝিল্লিরা সব ডাকে,
নিঝুম রাতে হুতুম চেঁচায় হঠাৎ অশথ-শাখে।
স্বপ্ন! স্বপ্ন! স্বপ্ন!
রূপকথাটি আঁকড়ে বুকে খোকন ঘুমে মগ্ন।

জানলা দিয়ে মুখটি বাড়ায় রাজপুত্রের ঘোড়া
মুক্তা গাঁথা ঝালর মাথায় হিরের লাগাম মোড়া,
ডাগর চোখে বলছে, 'খোকা ঘুমিয়ো নাকো আর,
পিঠের ওপর বসিয়ে তোমায় ছুটব সাগর-পার,
কড়ির পাহাড়, হাড়ের পাহাড় পেরিয়ে অচিন দেশে
রূপকুমারীর রাজ্যে তোমায় পৌঁছে দেব শেষে।'
স্বপ্ন! স্বপ্ন! স্বপ্ন!
থমথমে রূপকথার দেশে খোকন ঘুমে মগ্ন।

হাতে কলমে

১. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

১.১ কে বুকে রূপকথা জড়িয়ে ঘুমে মগ্ন?

১.২ ‘কল্পলোক’ মানে কী?

১.৩ কল্পলোকের মানুষদের বর্ণনা দাও।

১.৪ কে চরকা কাটে?

১.৫ দিগন্তহীন মাঠটির নাম কী?

১.৬ ঝিল্লিরা কীভাবে ডাকে?

১.৭ নিঝুমরাতে অশথ-শাখে কে চেঁচায়?

১.৮ জানলা দিয়ে কে মুখ বাড়ায়?

১.৯ তার সাজ-পোশাক কী রকম?

১.১০ কে, কাকে পিঠের উপর বসিয়ে কোথায় নিয়ে যেতে চায়?

১.১১ কড়ির পাহাড়, হাড়ের পাহাড় পেরিয়ে কোন দেশ?

১.১২ সেখানে কে থাকে?

শব্দার্থ : মগ্ন — ডুবে আছে যে, তলিয়ে গেছে যে। কল্পলোক — কল্পনার পৃথিবী। ফানুস — কাগজের তৈরি বেলুন, যা তপ্ত ধোঁয়া বা গ্যাসের সাহায্যে আকাশে ওড়ানো হয়। ফোকলা — যার দাঁত নেই, দন্তহীন। চরকা — সুতো কাটার যন্ত্র। খেই — প্রান্ত, শেষ। দিগন্ত — আকাশ ও পৃথিবীর মিলনস্থল, দিকচক্রবাল। দিগন্তহীন — বিস্তীর্ণ, বিশাল। তেপান্তরের মাঠ — রূপকথায় বর্ণিত বিরাট মাঠ। বিষণ্ণ — বিষাদগ্রস্ত, দুঃখী। ঝিল্লি — ঝিঁঝি। নিঝুম — নিঃশব্দ। হুতুম — পেঁচা। অশথ-শাখে — অশ্বত্থ গাছের ডালে। ঝালর — কাপড়ের তৈরি জিনিসের কারুকার্যময় ও কোঁচকানো প্রান্তভাগ। লাগাম — ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণের জন্য মুখে বাঁধা দড়ি, রশি। ডাগর — বড়ো বড়ো। কড়ি — একরকম সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষ, আগে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হতো। অচিন — অচেনা, অজানা।

২. **শব্দঝুড়ি থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও :**

২.১ কারুর চোখে _____ আঁটা, কারুর মুখে দাড়ি।

২.২ স্বপ্নবুড়ি _____ থামায় হারায় সুতোর খেই।

২.৩ নিঝুম রাতে _____ চেঁচায় হঠাৎ অশথ-শাখে।

২.৪ মুক্তা গাঁথা _____ মাথায় হিরের লাগাম মোড়া।

২.৫ থমথমে রূপকথার দেশে _____ ঘুমে মগ্ন।

হুতুম, খোকন, চশমা, ঝালর, চরকা

৩. **'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :**

ক	খ
তেপান্তর	পাহাড়
কড়ি	দেশ
চোখ	শাখা
অশথ	মাঠ
অচিন	চশমা

৪. **এই কবিতায় যে সমস্ত শব্দজোড়ে ছন্দের মিল আছে তার মতো অন্তত পাঁচটি জোড়া খুঁজে লেখো (একটি করে দেওয়া হলো) :**

মানুষ
ফানুস

বিমলচন্দ্র ঘোষ (১৯১০ - ১৯৮১) : বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার। তাঁর কবিতার বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'জীবন ও রাত্রি', 'সাবিত্রী', 'উদাত্ত ভারত'। 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা', 'শোনো বন্ধু শোনো, প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা'র মতো বিখ্যাত গান তিনি রচনা করেছেন।

৫. তুমি কি রূপকথার গল্প পছন্দ করো ? যদি পছন্দ করো তবে কেন পছন্দ করো, লেখো। কোনো রূপকথা কি তুমি শুনেছ? শুনলে কার কাছ থেকে শুনেছ?

৬. তুমি কি স্বপ্ন দেখো? তোমার শেষ দেখা স্বপ্নটির কথা লেখো।

৭. স্বপ্নে যদি তুমি কোনও অচিন দেশে পৌঁছে যাও তবে সেখানে কী কী তুমি দেখতে চাইবে আর কী কী দেখতে চাইবে না লেখো।

৮. নীচের সূত্রগুলি কাজে লাগিয়ে শব্দ ছকটি পূরণ করো :

১.			২.		৩.		৪.				৫.
	৬.								৭.		
								৮.			
	৯.					১০.			১১.		
১২.			১৩.								১৪.
						১৫.					
		১৬.			১৭				১৮.		

পাশাপাশি

১. ঝিঁ ঝিঁ শব্দে কারা ডাকে?

৪. স্বপ্নবুড়ি কী চালায়?

৬. তেপান্তরের মাঠটি কেমন?

৭. হুতুম পেঁচা যখন ডাকে তখন রাতটি কেমন?

১০. অচিন দেশে কে থাকে?

১২. রাজপুত্রের ঘোড়া কোথায় যাবে?

১৫. টাকা-____

১৬. সাগরপারের প্রথম পাহাড়টি কীসের?

১৭. যা গেঁথে ফেলা হয়েছে।

১৮. হিরের লাগাম মুক্তোর কী দিয়ে মোড়া?

উপর-নীচ

১. ঝিঁঝি-র ডাকে কেমন অবস্থা হয়?

২. কবিতায় কোন মাঠের কথা বলা হয়েছে?

৩. রূপকুমারীর রাজ্য কোন দেশে?

৪. কল্পলোকের কিছু মানুষের চোখে কী থাকে?

৫. অশথ-শাখে কে চেঁচায়?

৮. রাজপুত্র 'খোকা' হলে রাজকন্যা কী হবে?

৯. 'স্বপ্ন'-কে বলি 'স্বপন', 'মগ্ন'-কে বলি ____?

১০. খোকন বুকে কী জড়িয়ে ঘুমায়?

১১. ফোকলা দাঁতের ____

১৩. কড়ির ____, হাড়ের ____

১৪. রাজপুত্রের ঘোড়ার চোখটি কেমন?

সমাধান :

পাশাপাশি : ১. ঝিল্লি, ৪. চরকা, ৬. দিগন্তহীন, ৭. নিঝুম, ১০. রূপকুমারী, ১২. সাগরপার, ১৫. কড়ি, ১৬. হাড়, ১৭. গাঁথা, ১৮. ঝালর ।

উপর-নীচ : ১. ঝিম, ২. তেপান্তর, ৩. অচিন, ৪. চশমা, ৫. হুতুম, ৮. খুকু, ৯. মগন, ১০. রূপকথা, ১১. মাড়ি, ১৩. পাহাড়, ১৪. ডাগর ।

৯. খোকন রাজপুত্র হয়ে রাজকন্যা রূপকুমারীর প্রাসাদে যেতে চায়। পথে আছে তেপান্তরের মাঠ, হাড়ের পাহাড়, কড়ির পাহাড়, রাক্ষস-খোক্কস, দত্যি-দানো— কত কী! খোকন আর তার পক্ষীরাজ ঘোড়াকে নিরাপদ পথে রূপকুমারীর কাছে পৌঁছে দিতে পারো কি না, দেখি।
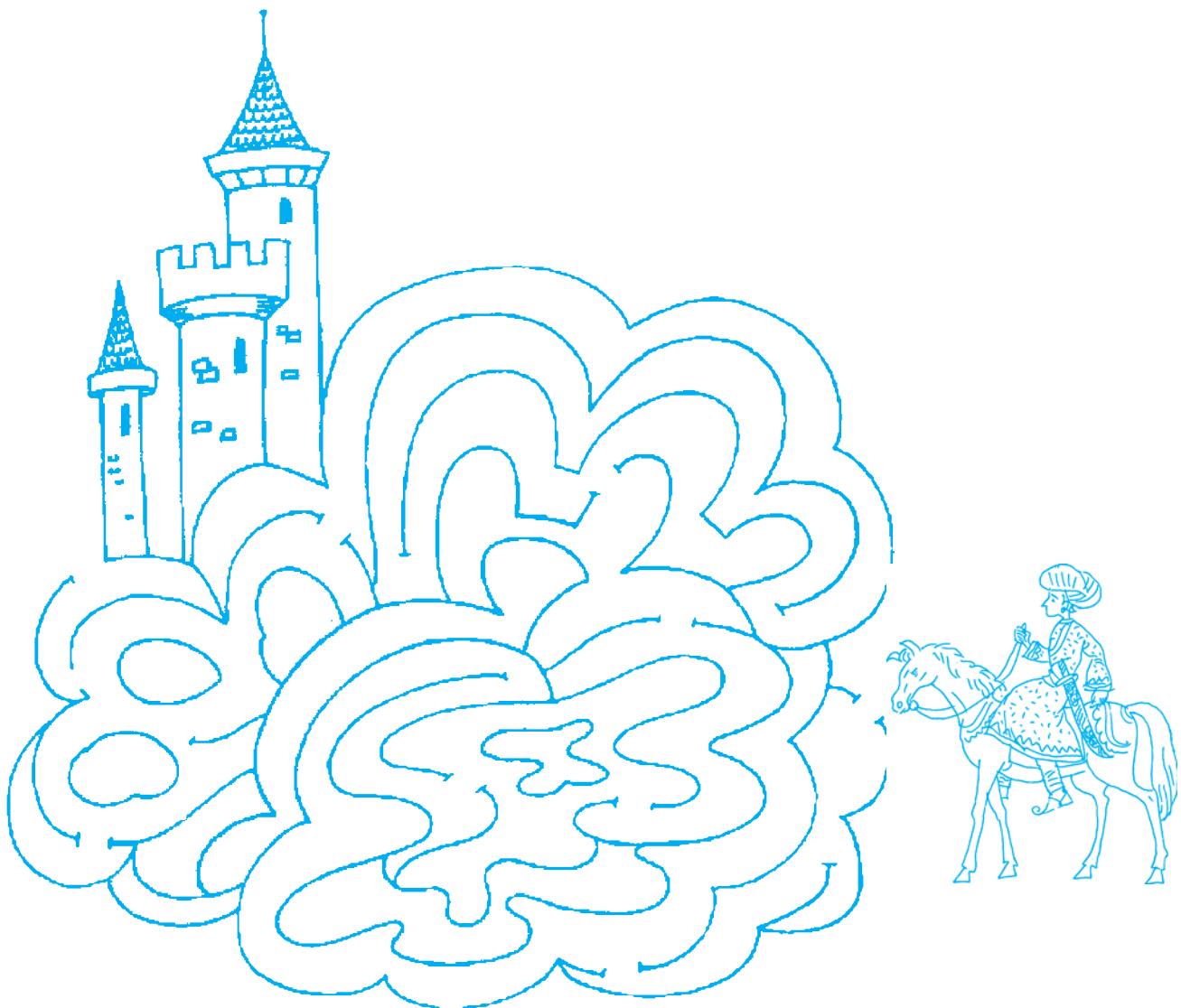
ভাষাপাঠ - এক

ভাষার কথা

ক্লাসে ঢোকার সময় শুনলাম সুমিতা রত্নাকে বলল, 'গল্পের বইটা আজ এনেছিস?' আর উত্তরে রত্না বলল 'একটু বাকি আছে, কাল আনব।' আর ক্লাসে ঢোকার পরে দেখলাম দেবাশিসের হাতে বল। শেষ বেঞ্চি থেকে স্বপন কোনো কথা না বলে দেবাশিসের দিকে হাত নাড়ল আর দেবাশিস বলটা পকেটে চালান করে দিল, এ দুটো কিন্তু একই ব্যাপার।

স্বপন অবাক হয়ে বলল, কিন্তু আমি তো কথা বলিনি। রত্না আর সুমিতা কথা বলেছিল। তাহলে স্যার?

তাহলে তোমাদের দুটো গপ্পো বলি। তোমরা তো রেলগাড়িতে চড়েছ। অনেক সময় কেউ কোথাও নেই, চারদিকে ধু ধু মাঠ। কেউ বলেনি 'দাঁড়াও' কিন্তু রেলগাড়ি থেমে যায়। কেন?

সবাই হই হই করে বলল, সিগন্যালে লাল আলো জ্বলে বলে। সবুজ আলো জ্বললেই আবার ট্রেন চলতে থাকে।

বেশ। তাহলে কৌশিকের কথা বলি। ও আজ একটু চুপচাপ, একটু মনমরা। কেন জানো? কাল বিকেলে খেলার মাঠে কল্যাণকে কাটাতে না পেরে সবার চোখের আড়ালে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু কল্যাণ তো ওর বন্ধু। আজ সকাল থেকে কল্যাণ ওর সঙ্গে কথা বলছে না দেখে কৌশিক বুঝতে পেরেছে কল্যাণ অভিমান করেছে। কিন্তু কল্যাণ তো ওকে কিছু বলেনি। তাহলে কৌশিক কী করে বুঝল?

এবারও সবাই বলল, কল্যাণের হাবেভাবে।

তাহলে দেখো, সুমিতা-রত্নার কথা বলা, স্বপনের হাত নাড়া, সিগন্যালের লাল সবুজ আলো আর কল্যাণের হাবভাব — এ সবই আসলে কথা। ভাষা।

স্বপন আবার বলল, সুমিতা-রত্না কথা বলেছিল কিন্তু এ সবের ক্ষেত্রে কেউ তো কথা বলেনি।

বলেছিল। তুমি হাতের ইশারায় বলেছিলে, মাস্টারমশাই আসছেন। বলটা লুকিয়ে ফেল। সিগন্যালের লাল রং বলেছিল, যেও না সামনে বিপদ। আর সবুজ রং, বলেছিল বিপদ কেটে গেছে, এবার যাও। কল্যাণের হাবভাব বলেছিল 'শুধু শুধু আমায় মারলি, তুই আর আমার বন্ধু নোস'।

বলেছিল বলেই না দেবাশিস বলটা লুকিয়ে ফেলল, ট্রেন থামল, আবার চলতে শুরু করল আর কৌশিক মনমরা হয়ে আছে। আসলে মুখ দিয়ে শব্দ করে আমরা যে কথা বলি, সেটাই একমাত্র ভাষা নয়। অন্যান্য ভাবেও কথা বলা যায়। ভাষা হলো, যা বোঝা যায়, আবার অন্যকে বোঝানোও যায়।

এবার বলতে পারো কেমন করে বুঝল রত্না সুমিতার কথা বা সুমিতা রত্নার কথা? লাল আলো মানে যে থামতে হয় আর সবুজ আলো মানে যে যেতে হয় বা স্বপনের ইশারা — এ সব কীভাবে বোঝা গেল?

উত্তরটা সুমিতাই দিল, রত্না যে ভাষায় কথা বলেছিল সে-ভাষা আমরা জানি। লাল আলো মানে বা সবুজ আলোর মানেও সবাই জানে।

তার মানে প্রত্যেকটি ভাষার কিছু নিয়ম থাকে, সেই নিয়ম যারা জানে, তারা সেই ভাষা বুঝতে পারে। ভাষার নিয়ম নিয়েই আমরা কথা বলব। তবে এবার আমরা সেই ভাষা নিয়েই কথা বলব, যে ভাষা আমরা মুখে বলি। ইশারা বা হাবভাবের ভাষা নিয়ে নয়। আসলে ইশারার ভাষা বা হাবভাবের ভাষা দিয়ে বেশিক্ষণ কথা চালানো যায় না। অথচ মুখ দিয়ে কিছু আওয়াজ করে আর সেই আওয়াজগুলোকে জুড়ে নিয়ে সাজিয়ে আমরা অনর্গল কথা বলে যাই।

এই ম্যাজিকটা একমাত্র মানুষই আয়ত্ত করতে পেরেছে, অন্য প্রাণীরা পারেনি। এখন এই ম্যাজিকটা কিন্তু আসলে নিয়মের ম্যাজিক।

কৃশানু এমনিতে চুপচাপ, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন প্রশ্ন করে, সকলকে অবাক করে দেয়, মনে হয় না যে ও তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র! সেই কৃশানুই প্রশ্ন করল, বাংলা ভাষা আমরা সবাই বুঝতে পারি, কথা
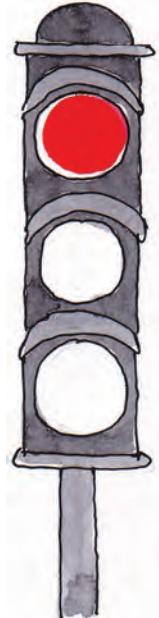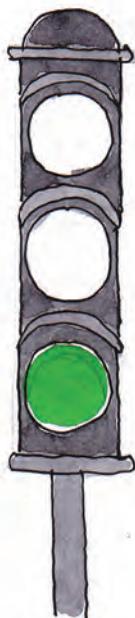
বলি। তার মানে তো নিয়মগুলি আমাদের জানা। জানা-না-হলে কী করে বুঝতাম আপনার কথা, বন্ধুদের কথা?

একদম ঠিক বলেছ তুমি। তোমরা সবাই এই নিয়মগুলি জানো। কবে জেনেছিলে তোমাদের মনে নেই। মনে থাকবার কথাও নয়। কিন্তু সেই জানা নিয়মগুলোকেই এবার স্পষ্ট করে আমরা জানব। শুনলে অবাক হবে এই পৃথিবীতে ছ-হাজারটা ভাষায় মানুষ কথা বলে। তুমি যেমন বাংলা বলো, তেমনি অনেকে বলে হিন্দি বা ইংরেজি, সোয়াহিলি...। তুমি যদি চাও বাংলা ছাড়া আরেকটা ভাষা শিখতে, তাহলেই প্রয়োজন হবে নিয়মগুলোকে স্পষ্ট করে শিখে রাখার।

ভাষা নিয়ে চর্চা যাঁরা করেন, তাঁরা দেখিয়েছেন যে, যে-কোনো ভাষার মধ্যেই এমন কিছু নিয়ম আছে, যা অন্যভাষার মধ্যেও থাকে। তাই তুমি যদি তোমার ভাষার নিয়মকে ভালো করে জানো, দেখবে সহজেই তুমি শিখে নিতে পারবে অন্য ভাষাও।

ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে লিখলাম রত্না আর সুমিতার সকালের কথাগুলো : গল্পের বইটা আজ এনেছিস? একটু বাকি আছে। কাল আনব।

এই কথাগুলো রত্না আর সুমিতা বলেছিল। এরকম সারাদিনে তোমরা কত কথা বলো। কিন্তু আসলে কথার ছলে তোমরা কী বলো?

সবাই দেখলাম চুপ।

দেখো, তিনটি অংশ আছে ওদের কথায়। প্রতিটি অংশই মোটামুটি নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে। অন্যের উপর নির্ভর করছে না। এই এক-একটা অংশ হলো 'বাক্য'। আমরা আসলে সারাদিনে কথার ছলে 'বাক্য' বলি।

কতগুলো বাক্য বলি একদিনে, সেটা একবার গুনে দেখো। চমকে যাবে কিন্তু ...
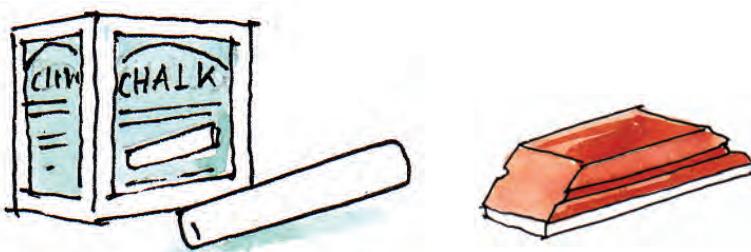
ভাষা পাঠ - দুই
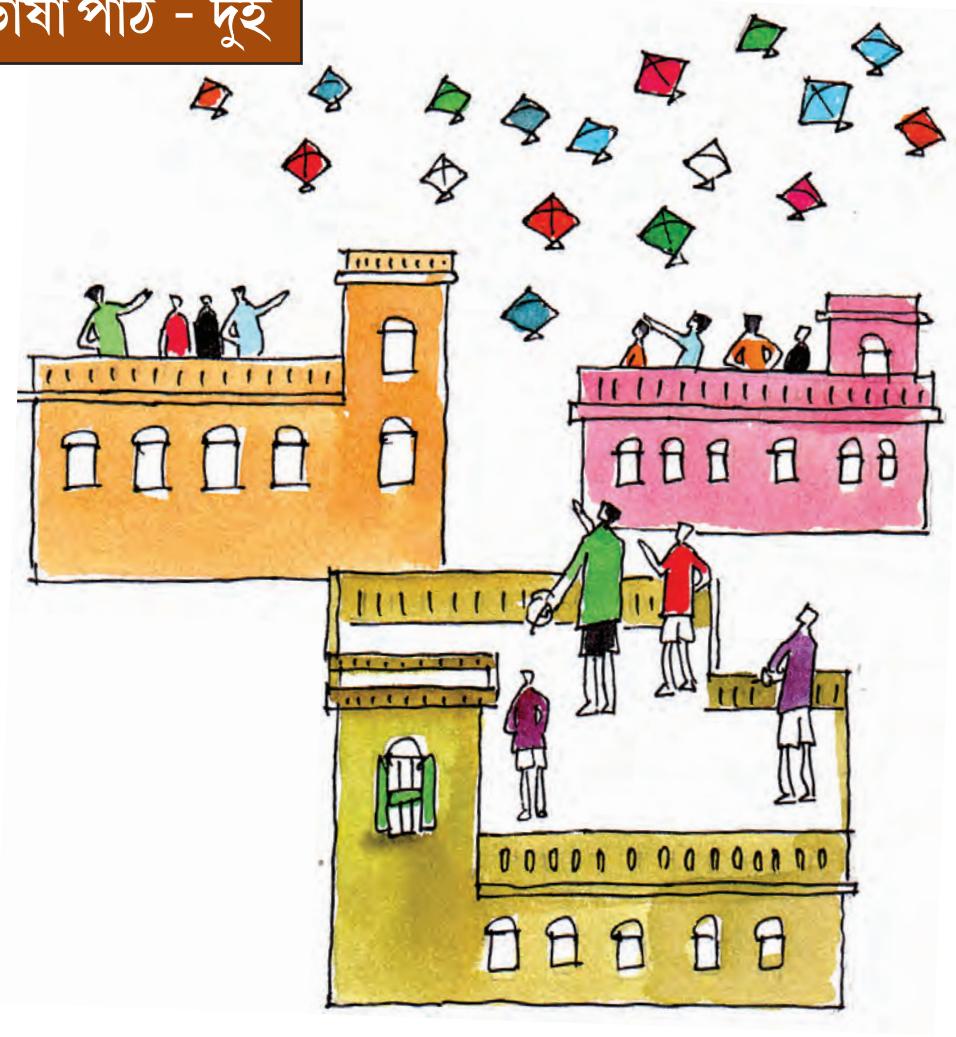
বাক্যের কথা

তোমরা যে গ্রামে বা পাড়ায় থাক, সেই গ্রাম বা পাড়া গড়ে ওঠে কয়েকটা বাড়ি নিয়ে। আবার সেই বাড়ির ভিতর কী থাকে?

সবাই বলল, ঘর।

ঠিক, এক বা একাধিক ঘর। তবে সব ঘর একরকমের নয়। বাড়ির ভিতর কত রকমের ঘর থাকে?

এক-একজন এক-একটা ঘরের কথা বলতে লাগল।

কেউ বলল শোয়ার ঘর , কেউ বলল খাওয়ার ঘর, বারান্দা, রান্নাঘর, চানঘর — এই সব।

তাহলে নানারকম ঘর দিয়ে তৈরি হয় বাড়ি। আবার কয়েকটা বাড়ি নিয়ে তৈরি হয় পাড়া। এবার বলো তো, ভাষার নিয়ম নিয়ে কথা বলতে এসে পাড়ার কথা কেন বলছি? পাড়া বাড়ি ঘর এই সব মিলে যায় কীসের সঙ্গে?

আমাকে অবাক করে দিয়ে কয়েকজন বলে দিল, পাড়া হলো আসলে বাক্য। বাড়ি হলো শব্দ।

আর ঘর?

এইবার সকলে একটু বিপদে পড়েছে বলে মনে হলো। কেউ বলল ধ্বনি, কেউ বলল বর্ণ।

এখানে তোমাদের চুপি চুপি বলি, ধ্বনি আর বর্ণ কিন্তু এক নয়। ধ্বনি হলো আমরা যা উচ্চারণ করি আর বর্ণ হলো সেই ধ্বনির লিখিত চেহারা। সহজ করে বললে, আমরা যা দেখি তা হলো বর্ণ আর কানে যা শুনি তা হলো ধ্বনি। তাই কানে যে ধ্বনি শুনি বা মুখে বলি তার লিখিত রূপ বর্ণ। ধ্বনির সঙ্গে সবসময় যে বর্ণ মিলে যাবে, এরকম নাও হতে পারে। যেমন ধরো আমরা বলি 'অ্যাখোন', কিন্তু লিখি 'এখন'।

আমাদের মুখে বলা অ্যা- ধ্বনি আর লিখিত এ-বর্ণ মেলে না। যদি বলি তোমাদের, বলো তো বাংলা ভাষার স্বরবর্ণ কী কী?

সবাই বলল, অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ। বেশ। কিন্তু আমরা যখন কথা বলি তখন সেই কথার মধ্যে স্বরধ্বনির সংখ্যা কমে যায়। হয়ে যায় : অ আ ই উ এ ও অ্যা।

তাহলে স্যার ঈ, ঊ, ঋ, ঐ, ঔ কোথায় গেল?

দেখো হ্রস্ব আর দীর্ঘ আলাদা করে উচ্চারণ আমরা করি না। আমাদের হ্রস্ব ই আর দীর্ঘ ঈ মিলে শুধু হ্রস্ব ই হয়ে যায়। একইভাবে উ আর ঊ মিলে শুধু উ হয়। ঋ আমাদের উচ্চারণে (র্ + ই =রি) হওয়ায় ব্যঞ্জনধ্বনি হয়ে যায়। আর আছে ঐ আর ঔ। বলো তো, ঐ আর ঔ ওর মধ্যে কী কী আছে।

প্রথমে একটু দমে গেলেও সবাই বারবার উচ্চারণ করে দেখালো যে, ঐ = ও + ই আর ঔ = ও + উ।

ঠিক। দুটো করে স্বরধ্বনি রয়ে গেছে ঐ আর ঔ -এর ভিতরে। দুটো আছে বলে এদের দ্বিস্বর বলে। আসলে ঠিক দুটো নয়, দেড়খানা। ও- র সঙ্গের ই আর ও- র সঙ্গে উ অর্ধস্বর। যাইহোক দুটো দ্বিস্বরের ধ্বনি আছে আমাদের বাংলায়, কিন্তু এরকম দ্বিস্বর আমরা অনেক বলি, অথচ তাদের কোনো নির্দিষ্ট বর্ণ নেই। যেমন, ভাই (আই্), ঝাউ (আউ্), আয় (আএ্), নেই (এই্) ইত্যাদি। তাহলে বুঝতে পারছ স্বরবর্ণ বলতে যা তোমরা দেখেছ, তার সঙ্গে স্বরধনির কত তফাৎ!

যাই হোক , আমরা যে পাড়ার কথা বলছিলাম, সে-রকম ভাষার মধ্যেও এক-একটা পাড়া থাকে। যাকে আমরা বলেছি বাক্য। সেই বাক্য আবার তৈরি হয় শব্দ বা বাড়ি দিয়ে আর বাড়ির ভিতরের ঘরগুলো হলো বর্ণ।

তাহলে 'আমি সকালে অঙ্ক করেছি' —এই পাড়াটায় কটা বাড়ি আছে?

সবাই বলল, চারটে বাড়ি আছে।

বেশ। এবার বলো 'আমি' বাড়িটায় কটা ঘর আছে?

দুটো স্যার। 'আ' আর 'মি'।

এইবার কিন্তু তোমরা ঠকে গেলে। একটা ঘর বেশি হবে। কীভাবে হবে ব্ল্যাকবোর্ডে করে দেখাচ্ছি :

আ + ম্ + ই। এই দেখো তিনটে ঘর। ম্-ঘরে ই-এর ঘর মিশে আছে। অনেক সময়ে তোমরা দেখবে কোনো কোনো বাড়িতে একটা বড়ো ঘর থাকে। যেমন এখানে আ। আর দুটো ঘর মিশে আরেকটা ঘরের মতো লাগে। ম্ আর ই সেই রকম দুটো ঘর।

তিনটে ঘর, কিন্তু তিনটে ঘরই আলাদা রকমের। তোমাদের এবার বলি ঘর কতরকমের হতে পারে!

ঘর দুধরনের হতে পারে। এমন ঘর যারা বেশ বড়ো, আবার অন্য ঘরের সঙ্গে মিশে সেই ঘরটাকে তৈরি করে। যেমন একটু আগে তোমরা দেখলে ই কেমনভাবে ম্-এর সঙ্গে মিশে মি তৈরি করে। ভাষার ক্ষেত্রে আমরা এদের স্বরধ্বনি বলি। তোমরা বলতে পারবে কেন স্বরধ্বনির

ঘরগুলো একা থাকে বা অন্য ঘরের জন্য দরকার হয়?

আমরা পড়েছি যে স্বরধ্বনি নিজে নিজেই উচ্চারিত হতে পারে, তাই এরকম বলা যেতে পারে ।

বেশ, কিন্তু তোমাদের মনে হয়নি যে নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে, মানে আসলে কী? আমি বলে দিচ্ছি। বলো অ। বলো আ বা উ বা এ। মুখের ভিতর থেকে যে হাওয়াটা বেরিয়ে আসছে সেখানে কেউ বাধা দিচ্ছে না। জিভ উঠে গিয়ে একবারও পথ বন্ধ করছে না। ঠোঁট দুটোও চট করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না। শুধু মুখের ভিতরটা কখনো পুরো খোলা থাকছে, কখনো সরু হয়ে যাচ্ছে...এই জন্য বলা হয় স্বরধ্বনি নিজে নিজে উচ্চারিত হয়। এটা একরকমের ঘর। আরেক রকমের ঘর হলো ব্যঞ্জনধ্বনি। কাকে বলে ব্যঞ্জনধ্বনি?

যে ধ্বনি নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে না, স্বরধ্বনির সাহায্যে উচ্চারিত হয়...

এইবার তোমরাই বলো এর মানে আসলে কী?

সবাই একটু নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নিল। মুখের মধ্যে জিভ দিয়ে নানারকম আওয়াজ করল। তারপর বলল, এইবার মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা হাওয়া কেউ না কেউ আটকে দিচ্ছে। জিভ নানা সময়ে নানা জায়গায় পথ আটকাচ্ছে। পথ আটকাচ্ছে ঠোঁটও। তবে একটুখানি সময়ের জন্য, আর তার ফলেই ব্যঞ্জনধ্বনি সৃষ্টি হচ্ছে।

অনেকটা ঠিক। সবটা নয়। তোমরা যা বলেছিলে তার শেষ কথাটা কিন্তু এখনও বোঝা গেল না। তোমরা বলেছিলে, স্বরধ্বনির সাহায্য লাগে ব্যঞ্জনধ্বনি বলার ক্ষেত্রে। কেমন এই সাহায্য? আমিই বলছি।

দেখো। প্রথমে ঠোঁটদুটো দিয়ে আটকাও হাওয়ার পথ এবং সেই পথ ছেড়ে দাও অ বলতে চেয়ে। দেখো, প, ফ, ব, ভ বেরোলো। আবার একই ভাবে আটকাও পথ। আ বলতে চেয়ে ছেড়ে দাও পথ। এইবার হলো পা, ফা, বা, ভা। একইভাবে আবার পথ আটকাও, ই বলতে চাও, দেখো হবে পি, ফি, বি, ভি। তাহলে বুঝতেই পারছ কীভাবে স্বরধ্বনি বয়ে নিয়ে এল ব্যঞ্জনধ্বনিকে।

আরেকভাবে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করা যায়। সে ক্ষেত্রেও স্বরধ্বনি লাগে। আগের ক্ষেত্রে হয়েছে পা (প্ + আ) বা পি (প্ + ই)। এবার আগেই বসাও স্বরধ্বনি তারপর ব্যঞ্জনধ্বনি। কী রকম হবে দেখো: আ + প্ = আপ বা ই + প্ = ইপ। এক্ষেত্রেও ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে স্বরধ্বনির সাহায্যে। কিন্তু শুধু প্ বা ব্ উচ্চারণ করতে পারবে না।

তাহলে ঘর তিন রকমের। স্বরধ্বনির ঘর, ব্যঞ্জনধ্বনির ঘর আর ব্যঞ্জনধ্বনির ঘরের লাগোয়া স্বরধ্বনির ঘর যেটা না থাকলে ব্যঞ্জনধ্বনি বলা যেত না, যাকে আমরা স্বরচিহ্ন দিয়ে চিনি (একমাত্র অ ছাড়া)।

এইবার তাহলে দেখো তো, 'আমি সকালে অঙ্ক করেছি' পাড়াটার ঘরগুলো কেমন?

■ নীচে কয়েকটি বাক্য দেওয়া হলো। এই বাক্যগুলোর শব্দ কীভাবে তৈরি লেখো :

- আজ ছুটি।
- আজ পনেরোই আগস্ট।
- সকালবেলাই ইসকুল থেকে ফিরে এসেছি।
- ইসকুলে ফ্ল্যাগ তোলা হলো সকালে, তারপরেই ছুটি।
- তখনই কী আশ্চর্য, বিরাট এক ঝাঁক ধবধবে সাদা পাখি ঠিক তক্ষুনি আকাশ দিয়ে, ফ্ল্যাগের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।
- এমন ছায়াভরা আকাশে যখন ফ্ল্যাগটা উড়ল, আমরা 'জনগণমন' গান গাইলাম।

ভাষাপাঠ - তিন

বর্ণ আর ধ্বনির কথা

বাড়ির মধ্যে কটা ঘর আর কেমন সেই ঘর, ক্লাসের সবাই খুঁজতে লেগে গেল। আমি ভাবলাম জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখি। সকালের নরম আলোয় কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে! যেই না ভাবা, অমনি দেবাশিস এসে হাজির 'সকাল' নিয়ে। মুখে, বিকেলের ছায়া। 'সকাল'-এর ভিতর কটা ঘর, বুঝতে পারছে না। ওর খাতার হিসেবে চারটে ঘর (স + ক্ + আ + ল)। দেবাশিসের লেখাটাই ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে সবাইকে বললাম, 'তোমাদের সব্বাইকার 'সকাল' কি দেবাশিসের মতো ?' সবাই দেখলাম বন্ধুর পাশেই দাঁড়াতে চাইছে।

আমার হিসেবে 'সকাল' -এর মধ্যে আরো একটা ঘর আছে। কেমন করে? এইভাবে 'স্ + অ + ক্ + আ + ল্' যেই লিখলাম, অমনি সবাই প্রতিবাদ করে বলল, স এর অ পেলাম কী করে!

আসলে প্রতিটি স্বরবর্ণের একটা করে স্বরচিহ্ন থাকলেও 'অ' এর কোনো আলাদা চিহ্ন নেই। আ-এর যেমন 'া', ই-এ যেমন ি, ঈ-এর ী। যেমন ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ো, ৌ, কিন্তু 'অ' এর কোনো চিহ্ন নেই, সে মিশে থাকে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে।

আমার কথাটা কৌশিকের খুব একটা পছন্দ হলো না : স্-এর অ মিশে থাকলে ল্-এর সঙ্গেও তো থাকবে? 'সকাল'-এর শেষে তো আমরা হসন্ত চিহ্ন দিই না।

কথাটা ঠিক। কিন্তু আমরা যে ভাবে 'সকাল' বলি, সেইভাবে লিখলে ল্ -এর পর অ দিতে হয় না। কিন্তু যদি 'অঙ্ক' কে ভেঙে লিখি, তাহলে শেষে অ লিখতে হবে, অ + ঙ্ + ক্ + অ।

কৌশিক সহজে মেনে নিতে চায় না। আমিই তো বারবার বলেছি যে মনে কোনো খটকা রাখবে না, সবসময় প্রশ্ন করে ঠিক উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবে। তাই কৌশিকের প্রশ্ন, আমরা তো অঙ্ক বলি না, বলি অঙ্কো, তাহলে তো শেষে অ হবে না, হবে ও।

আমি কৌশিককে বললাম, 'রবীন্দ্রনাথ'-বাড়িটার ঘরগুলো কেমন একটু দেখো তো।

কৌশিক লিখল : র্ + অ + ব্ + ঈ + ন্ + দ্ + র্ + অ + ন্ + আ + থ্।

লেখার পর বলল, দুটো অ-কেই ও করে দেওয়া উচিত।

করলে না কেন?

ও চিহ্ন তো দেওয়া নেই, তাই করলাম না। কিন্তু আমরা তো রোবিন্দ্রোনাথ্-ই বলি!

এক কাজ করো : র্ + অ + ব্ -এর পর থেকে মুছে দাও। তাহলে কী হলো? রব। 'রব' মানে জানো তো? 'পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল' কবিতাটি শুনেছ?

সবাই বলল হ্যাঁ।

তাহলে 'র্ + অ + ব্' কে কী বলো রোব্ না রব্?

এবার কল্যাণ বলল, আমরা তো রোববার বলি, রববার বলি না।

দেখে ভালো লাগল যে ভাষার যুদ্ধে কল্যাণ তার অভিমান ঝেড়ে ফেলে বন্ধুর পাশেই দাঁড়িয়েছে।

আসলে রোববার এসেছে রবিবার থেকে। রবিবার তো আমরা বলি না, বলি রোবিবার। সেখান

থেকে রোববার। এটা শুধু বাংলা ভাষায় হয়, এমন নয়। অন্যান্য ভাষাতেও এইরকম নানা উচ্চারণ আছে।

ইংরেজিতেই দেখো,

a-এর কত রকম উচ্চারণ:

cat-এ ক্যাট অর্থাৎ অ্যা
কিন্তু, art-এ আর্ট অর্থাৎ আ
আবার, ape-এ এপ অর্থাৎ এ
আবার, all-এ অল অর্থাৎ অ

e-এরও নানারকম:

egg — এগ অর্থাৎ এ
আবার, electric — ইলেকট্রিক অর্থাৎ ই

i-এর উচ্চারণেও এই ব্যাপারটা আছে,

ink — ইংক অর্থাৎ ই
আবার, ice cream — আইসক্রিম অর্থাৎ আই

u-এর ক্ষেত্রেও তাই,

but — বাট অর্থাৎ আ
আবার, put — পুট অর্থাৎ উ
কিন্তু, tube — টিউব অর্থাৎ ইউ

o-এর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার,

ox — অক্স অর্থাৎ অ
only — ওনলি অর্থাৎ ও
one — ওয়ান অর্থাৎ ওয়া
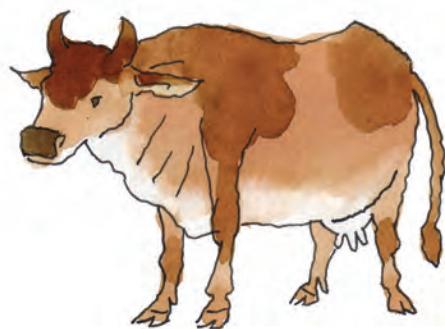
ঠিক আছে, আমাদের ভাষায় এরকম আরো লিখে দিচ্ছি :

রস	কিন্তু	রসিক	(রোসিক)
রস	কিন্তু	রসিয়ে	(গল্পটা রোসিয়ে বলছে)
রচনা	কিন্তু	রচিত	(রোচিত)
রহমত	কিন্তু	রহিম	(রোহিম)
বক	কিন্তু	বকুনি	(বোকুনি)
		বকুল	(বোকুল)
বংশ	কিন্তু	বংশী	(বোংশী)

এখন বলো তো, নীচের শব্দগুলো কী কী বর্ণ দিয়ে তৈরি ?

- সৌম্য
- স্বাধীনতা
- কম্পিউটার
- দর্পণ
- শরৎচন্দ্র
- প্রণাম
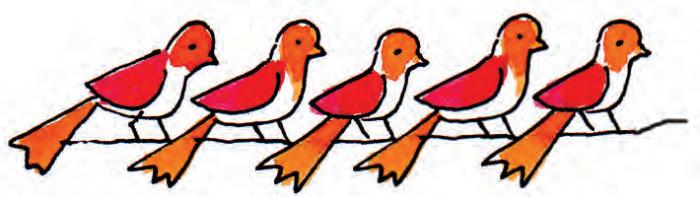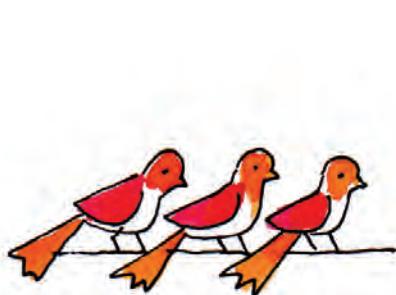
ভাষাপাঠ - চার

নিয়মের কথা
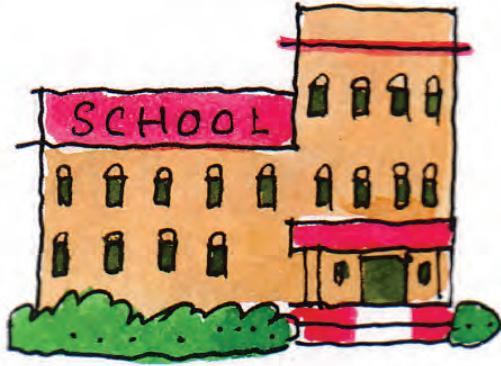
মেঘনার বাড়ির পিছনে একটা পুকুর ছিল। একদিন সেই পুকুর বুজিয়ে সেখানে বড়ো একটা বাড়ি তৈরি হলো। সেই থেকে খুব দুঃখ মেঘনার।

সেই দিন ক্লাসে ঢুকতেই মেঘনা অভিমানের গলায় বলে ফেলল, ভাষার পাড়ায় যে বাড়িগুলো থাকে, সেখানে কি কোনো নিয়ম আছে? যেখানে খুশি বাড়ি করা যায়?

নিশ্চয়ই আছে। নিয়ম না মানলে তো একের কথা অন্যে বুঝতেই পারবে না। আজ তোমাদের সেই নিয়মের কথাই বলব। তার আগে তোমরা বলো তো জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটা?

কিংশুক স্কুলে এসেই টিফিন খেয়ে নেয়। তাই শেষ বেঞ্চির কোণ থেকে বলল, খাওয়া।

সমস্ত ক্লাসে তখন সবাই হাসছে। আমি কিন্তু বললাম, কিংশুক একেবারে ভুল বলেনি। বরং অন্যরা কী বলবে বলো ?

কৌশিক বলল, লেখাপড়া করা।

তৌফিক বলল, অন্যকে সাহায্য করা।

রত্না বলল, বড়োদের কথা শোনা।

তোমরা সবাই কিংশুকের মতো একটু একটু ঠিক বলেছ। তোমাদের সবার কথা মিলিয়ে দিলেই ঠিক উত্তর পাওয়া যাবে। আমি তোমাদের সাহায্য করছি। তোমরা তোমাদের বইয়ের প্রথম পাঠের কথা মনে করো।

এইবার সবাই বলল, কাজ করা।

ঠিক। বাক্যের মধ্যে এই কাজ করা ব্যাপারটা থাকে। সবসময় যে খুব সরাসরি থাকে এমন নয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হোক, উহ্য থেকে হোক, যেভাবে হোক, থাকে। কিংশুকের প্রিয় কাজটাকেই আমরা উদাহরণ হিসেবে নিই : খাওয়া।

এখন খাওয়া বললেই তো হবে না। কাজ তো নিজে নিজে হয় না। কাউকে করতে হয়। কেউ না করলে কাজ বোঝা যায় না। তাই বাক্যে প্রধান হলো যে, কাজটা কার। যদি প্রশ্ন করি ‘কে খায়?’, তখন উত্তর হবে ‘কিংশুক খায়’। ‘কিংশুক খায়’ এই হলো একটা ছোট্ট ভাষার পাড়া। প্রথমে থাকবে ‘কিংশুক’ নামের বাড়ি, তারপর থাকবে ‘খায়’ বাড়ি।

কিন্তু তোমাদের তো মনে হতেই পারে ‘কিংশুক কী খায়?’ উত্তর হবে ‘কিংশুক লুচি খায়।’এইবার এই নতুন পাড়ায় আরেকটা বাড়ি হল ‘লুচি’। সে বাড়িটা হবে মাঝখানে।

ব্যাপারটা এই রকম :

কিংশুক	খায়	
কিংশুক	ভাত খায়	(কী খায়?)
কিংশুক	হাত দিয়ে ভাত খায়	(কীভাবে খায়?)
কিংশুক	হাত দিয়ে মাছের ঝোল আর ভাত খায়	(কী দিয়ে ভাত খায়?)

এইভাবে পাড়ায় নতুন নতুন বাড়ি হতেই পারে কিন্তু প্রথম আর শেষ বাড়িটা একই থাকে।

এই নিয়মেও মেঘনা খুশি হয় না। তাহলে মাঝখানে যে নতুন বাড়ি হবে, সেখানে কি আর কোনো নিয়ম থাকবে না, যে-যার খুশি-মতো বাড়ি করবে?

নিশ্চয়ই নিয়ম থাকবে সেখানে। নতুন যে বাড়ি করবে, দেখতে হবে এই পাড়ায় কার সূত্রে সে আসছে। যেমন ‘মাছের ঝোল’ এসেছে ভাতের সূত্রে। তাই সেই বাড়িটা ভাতের পাশে। সেক্ষেত্রে ভাতের যে-কোনো দিকে সে থাকতে পারে। ‘মাছের ঝোল আর ভাত’ হতে পারে। আবার ‘ভাত আর মাছের ঝোল’ —ও হতে পারে। কিন্তু ‘কিংশুক মাছের ঝোল আর হাত দিয়ে ভাত খায়’ কিছুতেই হবে না।

এইবার মনে হল মেঘনা যেন একটু শান্তি পেয়েছে।

নীচের পাড়াগুলোয় ঘর বাড়াও :

- তন্ময় পড়ে।
- রূপা যাচ্ছে।
- আবদুল এসেছে।
- তুমি আসবে?
- আমি যাব।
- পাখি ডাকছে।
- মেরি খেলছিল।
- ফুল ফুটেছে।

যে পাড়াটার মানে আছে তার পাশে (√) দাও। যে পাড়াটার মানে নেই তার পাশে (×) দাও :

- আমি গান। ☐
- বদিউর অঙ্কে ভালো। ☐
- তোমার নাম কী? ☐
- জল পড়ি। ☐
- বাঁকুড়া রাস্তা যাবার। ☐
- দিলীপ ছবি আঁকে। ☐
- নেকড়ের যাব কাছে না। ☐
- কই ভরা ডিম। ☐
- কাল ভোরে সূর্য উঠবে। ☐
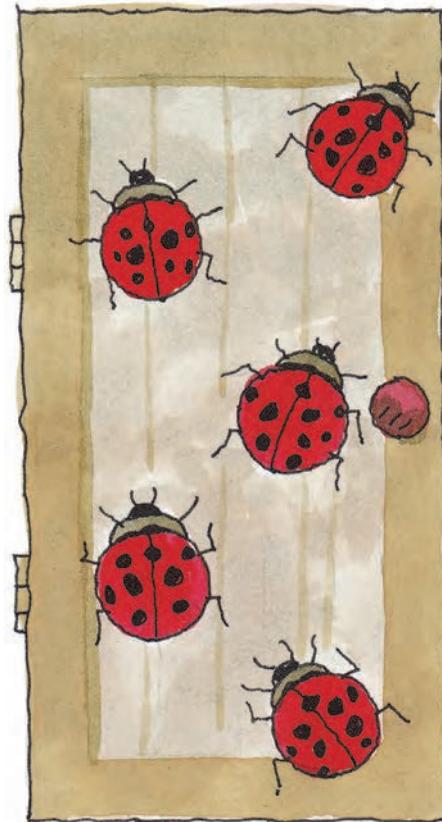
নীচের বাক্যগুলির কোনটি কাজ আর কে কাজ করছে তার নীচে দাগ দাও :

- আমি এখন ছবি আঁকছি।
- কোথায় যাচ্ছ ?
- তার চলে যাওয়ায় কাজটা শেষ হলো না।
- মেঘের পরে মেঘ জমেছে।
- আমি রুদ্রকে বই দিলাম।

অলংকরণ সহায়তা : সুব্রত মাজী

আমার পাতা-১

এই বই তোমার কেমন লেগেছে? লিখে, এঁকে বুঝিয়ে দাও:

আমার পাতা-২

এই বই তোমার কেমন লেগেছে? লিখে, এঁকে বুঝিয়ে দাও:

শিখন পরামর্শ

- বইটির পরিকল্পনায় রয়েছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা—২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন—২০০৯ নথি দুটিকে ভিত্তি করে পাঠ্যবইটি (তৃতীয় শ্রেণি— বাংলা) রূপায়িত হয়েছে। পড়ানোর আগে পুরো বইটি যত্ন নিয়ে শিক্ষিকা/শিক্ষক পড়ে নেবেন।

- পাঠ্য এই বইটির ভাবমূল (Theme) '**প্রচলিত গল্পকথার জগৎ**'। ছোটোরা এই বইয়ে নিকোবরি, মারাঠি, সাঁওতালি প্রভৃতি নানান উপকথা যেমন বাংলায় পড়বে, তারই সঙ্গে মজার ছড়া, কবিতা, সাহসিকতার গল্প, মনীষীদের কথা, নদীর গল্প, স্বদেশ কথা, স্বপ্নের কাহিনি, প্রতিবাদের গল্প এমনই নানা বিচিত্র বিষয় পড়বে। এই বিষয়গুলিকে আবার বিভিন্ন পাঠে ভাগ করা হয়েছে। সেই সমস্ত পাঠগুলি আবার ছড়া, গান এবং গল্প দিয়ে গড়া। এরা তুলে ধরে বিভিন্ন রকমের মূল্যবোধ কিংবা অনুভূতি। যেমন প্রথম পাঠটির মূল ভাব হলো কাজ ও তার মর্যাদা। পরের পাঠের বিষয় ছবি। এইভাবে বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সমাহারে গড়ে উঠেছে তৃতীয় শ্রেণির বাংলা বই। তবে মনে রাখতে হবে ভাবমূল (Theme) মানে কিন্তু বিষয়ের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি নয়, একটি গতিময় ঝোঁক। তা শিশু মনের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করে না, বরং উন্মুক্ত ও প্রসারিত করে। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে গিয়ে তাকে ভোলায়, ভাবায়, আলোড়িত করে। এভাবেই গড়ে ওঠে শিশুর নিজস্ব অভিব্যক্তি। তাই বইটিকে কাজে লাগিয়ে বদলাতে হবে শ্রেণিকক্ষের সংস্কৃতি। কিন্তু কীভাবে? সহজ ভাবে বলতে গেলে দলগত এবং একক এই দুই উপায়েই। শিশুকে হাতে-কলমে কাজে যুক্ত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তৎপর করে তুলে শিক্ষিকা/শিক্ষক তাকে সাহিত্য পঠনের পথ দেখাবেন। অন্যদিকে এই কাজ হবে ছাত্রছাত্রীর জীবন-অভিজ্ঞতা নির্ভর আর বৈচিত্র্যময়। আনন্দদায়ক স্ব-শিখনের পথে তাদের এগিয়ে দেবে। বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের বহু ধরনের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে রাখতে হবে যাতে সে পারস্পরিক সহযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত দক্ষতাও অর্জন করতে পারে।

- কিন্তু এগুলো শুধু কথার কথা নয়। এসবই বাস্তবায়িত করা যায়। কীভাবে? ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করা যাক। ভাষা-সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সময় আমরা শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে নেব। সবসময় এই দল হবে মিশ্র। সেখানে অপেক্ষাকৃত এগিয়ে থাকাদের সঙ্গে একই দলে একটু পিছিয়ে পড়ারাও থাকবে। এই দলগুলোর মাঝে আপনি হলেন সেতু। খেয়াল রাখবেন পঠন-পাঠন কখনোই একতরফা না হয়। পড়া আর হাতে-কলমে চর্চা চলবে সমানতালে। আপনাকে পড়ুয়াদের সঙ্গে খোলামেলা কথা চালাচালির পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। তারপর বিভিন্ন ছোটো ছোটো কাজের মাধ্যমে শিশুদের ভাবিয়ে তুলে, তাদের চিন্তা ও কল্পনাশক্তিকে স্বাধীনভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ করে দিতে হবে।

- এই বইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ছবি। শিশুমনের প্রাথমিক জড়তা কাটাতে এই ছবিগুলি হবে চাবিকাঠি। ধরা যাক গাছের ছবি। বইয়ে থাকা গাছের ছবি দেখিয়ে ছোটো ছোটো প্রশ্ন তৈরি করুন ওদেরও প্রশ্ন তৈরি করতে উৎসাহ দিন। এবার অন্য দলকে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে সাহায্য করুন। আপনি চাইলে এই আলোচনা চলার সময় শ্রেণিকক্ষের বাইরে সবাইকে নিয়ে কোনো গাছের কাছে চলে যান। ওদের দেখতে বলুন। ছবিতে দেখা গাছের সঙ্গে আসল গাছের মিল আর অমিল নিয়ে ছোটো ছোটো প্রশ্ন করুন। ওদের কাছ থেকে উত্তর খুঁজুন। গাছের ছবি আঁকতে বা প্রশ্নোত্তরের ঢঙে লিখতে উৎসাহ দিন।

- লক্ষ করে দেখুন পাঠে ঢোকার আগেই আপনি পাঠের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলেছেন। তবে আরও অনেক পথ আছে। চাইলে ধাঁধার আশ্রয় নিতে পারেন। গাছকে নিয়ে ছোটো কোনো ধাঁধা বানিয়ে বললেন— বলো তো এটা কী ?

- তাই আমরা সবসময় বিভিন্ন মজার আর আনন্দদায়ক খেলায় তাকে জড়িয়ে রাখব। ধরা যাক স্পষ্ট উচ্চারণে একটি দল পাঠের একটি অংশ পড়ল, সেখান থেকে যুক্তাক্ষর বেছে নিল আরেকটি দল। তারপর শ্রেণিকক্ষের সকলে মিলে যুক্তাক্ষর যুক্ত শব্দগুলি না দেখে লিখল। আবার দলে ভাগ হয়ে সেই শব্দগুলো দিয়ে তারা বাক্যরচনা করল মুখে মুখে। আপনি যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে দিয়ে দেখালেন। তা দিয়ে আবার নতুন দুটো শব্দ তৈরি করে, আরেক দলকে আরও কয়েকটা শব্দ তৈরি করতে শেখালেন। এসব ক্ষেত্রে যুক্তাক্ষরের কার্ড ব্যবহার করলে তা শিশুদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়।

- আবার হয়তো ফিরে এলেন ধাঁধায়— 'চাকা ঘোরাই বনবনিয়ে

  হাতে নিয়ে দণ্ড
  হরেক রকম বাসন বানাই
  নিয়ে মাটির মণ্ড' (কুমোর)

বলোতো আমি কে? কোনো ছবিতে গল্প নিয়েও কাজ করা যেতে পারে। অর্থাৎ এই ভাবে আমরা সবাইকে জড়িয়ে নেব। আমাদের মনে রাখতে হবে শিশুমন একটানা দশ থেকে পনেরো মিনিটের বেশি কোনো বিষয়ে একাগ্রতা রাখতে পারে না। তাই আমরা তাদের বিচিত্র আনন্দদায়ক

বিষয়ে জড়িয়ে রাখব যাতে তারা কখনই না ক্লান্ত হয়ে যায়। এক এক দিন, এক এক সময় , এক এক রকম। কখনো শুনে লেখা, কখনো শুনে বলা, কখনো ছবি আঁকা, কখনো বর্ণ বিশ্লেষণ, তা থেকে শব্দ, তারপর বাক্য, সেই বাক্য জুড়ে জুড়ে গড়ে তোলা যাক কোনো ভাবনা। রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে বলা যেতে পারে, '...বালক অল্পমাত্রও যেটুকু শিখিবে তখনি তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে'— সুতরাং প্রয়োগ বর্জিত যেকোনো শিখন অসম্পূর্ণ। কেননা প্রয়োগের মাধ্যমেই শিশুর আবছা ধাবণা আস্তে আস্তে জ্ঞান ও দক্ষতায় রূপান্তরিত হয়।

- ধরা যাক বইয়ের 'নিজের হাতে নিজের কাজ' গল্পটি পড়ে শোনানোর সময় আপনি এরকম অন্য কোনো মনীষীর কথা গল্পের ছলে বললেন। যার কথা হয়তো ওরা আগের শ্রেণিতে পড়েছে বা শুনেছে। এবার এই বিষয়ে ওদের স্বাধীনতা দিন আঁকতে, লিখতে, বলতে।

  আবার কখনও হয়তো গল্পপাঠ শেষ হলো। যেমন ধরা যাক 'সত্যি সোনা' গল্পের উদাহরণ দিই। আপনিই ছাত্রী/ছাত্রদের বললেন 'সত্যি সোনা' নামটা যেন কেমন? তাই না। এর চেয়ে ভালো নাম হবে, 'কর্মই ধর্ম' বা 'কাজের কোনো বিকল্প নেই'। বলে আপনি ওদের গল্পটার আরও ভালো নাম দিতে বলুন। ওদের দেওয়া নামগুলো বোর্ডে লিখুন। ওদের আলোচনা থেকে উঠে আসা একটি বিকল্প নাম 'সত্যি সোনা'র পাশে লিখুন। এভাবেই গল্প নিয়ে কথা বলতে বলতে বলুন, গল্পটার প্রধান প্রধান জায়গাগুলো তোমাদের কী মনে হচ্ছে বলো দেখি? আপনি হয়তো নিজে থেকে বললেন, চাষি ছেলেকে ডেকে বলল 'শোনো, এই যে আমাদের চাষের জমি দেখছ, এর নীচেই পোঁতা আছে লুকোনো সোনা'।। তারপর........ এভাবে এগোন। ঠিক-ভুল বিচার করতে সাহায্য করুন। সবাইকে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দিন। জড়িয়ে নিন। না পারলে সাহায্য করুন অপেক্ষাকৃত এগিয়ে আছে যারা তাদের, একটু পিছিয়ে যারা— তাদের সাহায্য করতে শেখান। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত দক্ষতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন। এবার, গল্প চুম্বক তৈরি হয়ে গেলে, নিজের ভাষায় গল্পটি আবার লিখতে সাহায্য করুন।

- এই ধরনের নানা দিশা বইয়ের 'হাতে-কলমে' অংশে রয়েছে। আপনি সেগুলিকে অবশ্যই কাজে লাগাবেন। মনে রাখবেন তৃতীয় শ্রেণি থেকেই শিক্ষার্থী ভাষাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বিভিন্ন ধরনের পাঠ যাতে স্পষ্ট ভাবে পড়তে পারে এবং পড়ে তা নিজের ভাষায় ছোটো ছোটো বাক্যে প্রকাশ করতে শেখে আমরা সেই চর্চা আরম্ভ করেছি। সুতরাং তাকে সক্রিয়তায় জড়িয়ে বলতে হবে। আর এই ধারাবাহিক চর্চা হবে আকর্ষণীয় ও মজার। এই চর্চায় আনতে হবে বৈচিত্র্য। কোনো ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি যেন শিশুমনে একঘেয়েমির সৃষ্টি না করে। যেমন কোনো শব্দের মিল দিয়ে শুধুই ছড়া-ছড়া খেলা যেতে পারে। আবার কোনোদিন ন্যায়-অন্যায় বোধ নিয়ে বিতর্কের সূচনাও করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের গল্পটিকে নিয়ে আপনিই হয়তো বললেন, কী দরকার ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের, ওর বোঝা না বইলেই পারতেন। এই বলে আপনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতর্ক তৈরি করে দিয়ে আরও দুয়েকটা মন্তব্য জুড়ে দিয়ে তর্কে ও মতামত প্রকাশ করতে উৎসাহ দিন। দেখবেন শ্রেণিকক্ষ হয়ে উঠেছে বিতর্ক সভা।
- অর্থাৎ কেবল যে বইয়ের ভোল-বদল ঘটেছে তাই নয় বদলে গেছে শ্রেণিকক্ষের সংস্কৃতি। শ্রেণিকক্ষ মানে প্রাণময়, চঞ্চল, জানতে ও পড়তে উৎসুক একরাশ কচিকাঁচা।
- ওদের পাঠ্যবইয়ের বাইরে আরও অন্যান্য বইয়ের অংশ পড়ে শোনান ও পড়তে উৎসাহ দিন। গড়ে তুলতে চেষ্টা করুন মুক্ত বহিঃদৃষ্টি আর যেকোনোরকম শিখনে ওদের হাতে তুলে দিন কর্তৃত্বভার।
- এবার আসি ভাষা পরিচয়ের কথায়। নতুন পাঠ্যক্রমের ভাষা-পরিচয় (ব্যাকরণ) শুরু হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণি থেকে। বাক্য দিয়ে এর শুরু। বাক্য- শব্দ-বর্ণ-ধ্বনি এবং ধ্বনি-বর্ণ-শব্দ-বাক্য এভাবে। এই দুই প্রক্রিয়ায়। মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীর কথোপকথনের ঢঙে। যাতে তা হয় পড়ুয়ার মনের কাছাকাছি। কেননা, আমাদের মাথায় আছে জীবন-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা, ব্যাকরণও সেই পথের অনুগামী। এই পাঠও হবে চর্চা-নির্ভর আনন্দদায়ক ও সহজবোধ্য।
- শিশুমনের বিকাশে শিক্ষিকা/শিক্ষকের ভূমিকাই প্রধান। পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর জীবন-অভিজ্ঞতা, চারপাশের প্রকৃতি আর বিস্তৃত বিশ্বভুবনকে সংযুক্ত করার চেষ্টা শিক্ষিকা/শিক্ষকদেরই করতে হবে।
- পাঠ্যবইয়ের রসহীন, আনন্দহীন এবং আতঙ্কময় তথ্য-তত্ত্বের মুখস্থ বিদ্যাচর্চা কোনোক্রমেই বিদ্যাশিক্ষা নয়। পাঠ্যপুস্তক পরিকল্পনায় এবং তার অনুশীলনীতে সেই প্রথাবদ্ধ ধরনকে বর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীকে নিয়মিত হাতের লেখা দিতে হবে। হাতের লেখা অভ্যাসের পাশাপাশি শেষ তিন লাইনে হাতের লেখার বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থী ছবি আঁকবে।
- 'হাতে-কলমে' অংশটিকে বিশেষ গুরুত্ব এজন্যই দেওয়া হয়েছে যে, শিক্ষার্থী একতরফা শুনে যাওয়ার পরিবর্তে সক্রিয়তার মাধ্যমে অনেক দ্রুত এবং কার্যকরভাবে শেখে।
- শিক্ষিকা/শিক্ষক প্রতিটি পাঠ পড়ানোর ক্ষেত্রে বা 'হাতে-কলমে' চর্চার প্রসঙ্গে যেকোনো ধরনের উজ্জীবনী তথা উদ্‌ভাবনী অংশ সংযোজন করতে পারেন।

- পাঠ্যসূচিতে থাকা গানগুলি শিক্ষিকা/শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে গেয়ে শোনাবেন, এছাড়া কোনো বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্যও নিতে পারেন। শিক্ষার্থীদের সমবেত সংগীতে অংশ নিতে উৎসাহিত করবেন। বসন্ত উৎসব, বর্ষামঙ্গল, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি উপলক্ষে যে সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ে হয়, এই গানগুলি সেখানে ব্যবহার করবেন। গানকে গান হিসেবেই ছাত্রছাত্রীদের সামনে রাখবেন। কবিতা হিসেবে নয়। পারলে আরো গান শেখান এবং শোনান।

এই বইটির প্রত্যেকটি পাঠ এক-একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। একটি পাঠ মানে কিন্তু একটি কবিতা বা গল্প নয়। একাধিক কবিতা বা গল্প নিয়ে একটি পাঠ তৈরি হয়েছে। এই পাঠের মধ্যে একাধিক গল্প-কবিতা যে বিষয়ের সূত্রে গাঁথা হয়েছে তা স্পষ্টকরে বলা ও বোঝানো প্রয়োজন।

- পুরো পুস্তকটিই পাঠ্য। অংশবিশেষ পাঠ্য নয়। পাঠদানের ধারাবাহিক গতি এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে স্থির করতে হবে, কিন্তু তা কখনোই পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের কথা ভুলে গিয়ে নয়।
- শিশুশিক্ষার্থীর সুবিধার কথা ভেবে বাংলাভাষায় অতিপ্রচলিত যে-শব্দগুলির দুটি অর্থ আছে, তাদের বানানে আমরা সামান্য পার্থক্য এনেছি। এইজন্য হতো, হলো, মতো, ভালো, করো প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

সম্ভাব্য সময় ও পাঠসূচি :

মাসের নাম	পাঠ	বিষয়	পাঠের নাম	মন্তব্য
জানুয়ারি	প্রথম	কাজ	সত্যি সোনা, আমরা চাষ করি আনন্দে, নিজের হাতে নিজের কাজ	ভাষার পাঠ শুরু হবে। চলবে পাঠের পাশাপাশি হাতে কলমের অভ্যেস
ফেব্রুয়ারি	দ্বিতীয়	ছবি আঁকা	দেয়ালের ছবি, সারাদিন	ভাষার পাঠ চলবে। পাঠের পাশাপাশি হাতে কলমের অভ্যেস
মার্চ	তৃতীয়	প্রকৃতিতে রং	ফুল, আজ ধানের ক্ষেতে	ভাষার পাঠ চলবে। পাঠের পাশাপাশি হাতে কলমের অভ্যেস
এপ্রিল	চতুর্থ	নদী	সোনা, নদী, নদীর তীরে একা	ভাষার পাঠ চলবে। পাঠের পাশাপাশি হাতে কলমের অভ্যেস
মে	পঞ্চম	পর্যটন ও অ্যাডভেঞ্চার	নৌকাযাত্রা, ঢেউয়ের তালে তালে, পর্যটন	যেহেতু মে মাসে গরমের ছুটি পড়ে, তাই এই পাঠ জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত হবে
জুন ও জুলাই	ষষ্ঠ ও সপ্তম	গাছ ও ঐক্য, বন্ধুত্ব	গাছেরা কেন, গাছ বসাব, জুঁইফুলের রুমাল একা একা, আরাম, সাথি	জুন মাসের শেষ থেকে আগস্ট মাসের দু-সপ্তাহ পর্যন্ত
আগস্ট	অষ্টম	দেশপ্রেম	মনকেমনের গল্প, দেশের মাটি	ভাষার পাঠ চলবে। পাঠের পাশাপাশি হাতে কলমের অভ্যেস
সেপ্টেম্বর অক্টোবর ও নভেম্বর	নবম দশম	মজা ও আনন্দ তিন রকমের লেখা	কীসের থেকে, আগমনী, উড়ুক্কু ভূত ইশপ, পানতাবুড়ি, ঘুমিয়ো নাকো আর	পুজোর ছুটির জন্য অক্টোবর ও নভেম্বর ধরে এই পাঠ চলবে